সমারোহ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র



* গুপ্ত প্রকাশিকা *

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা :

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক :

বাসন্তী দাসগুপ্তা

গুপ্ত প্রকাশিকা

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট্,

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :

বিজয়কুমার মিত্র

কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,

২৮ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট্,

কলিকাতা-৬

মূল্য : এগারোসিকা

উৎসর্গ

শ্রীমতী বর্ষা মিত্র

কল্যাণীয়াসু—

এই লেখকের—

মনে ছিল আশা
প্রভাত-সূর্য্য
রাত্রির তপস্যা
কাছে আছে যারা
রাত-মোহানা
সীমান্ত-রেখা
জ্যোতিষী
পুরুষ ও রমণী
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্
ভাড়াটে বাড়ী
স্বর্ণমুকুর
বহুবিচিত্র
নব যৌবন
দুর্ঘটনা
প্রেরণা

কমা ও সেমিকোলন
সাবালক
রজনীগন্ধা
কোলাহল
চতুর্দোলা
মিলনান্ত
নববধূ
স্মরণীয় দিন
ত্রুটি
শ্রেষ্ঠ গল্প
মালাচন্দন
আবছায়া
নারী ও নিয়তি
জন্মেছি এই দেশে
কলকাতার কাছেই

পরিকল্পনা

সতীশের হিসাববুদ্ধিটা ছেলেবেলা থেকেই খুব প্রবল। যা কিছু করুক না কেন—আগে থাকতে হিসেব করতে বসত। হিসেব আর পরিকল্পনা এ ছিল ওর প্রাণ—উঁহু, সমগ্র অস্তিত্ব। ভারত সরকার যখন প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন, তখন সতীশ ত হেসেই খুন। বলে, 'এতদিনে এঁদের মাথায় গেল! আমি ত কবে থেকে পাঁচসালা পরিকল্পনা করছি! বাজেট আর প্ল্যান—এ ছাড়া সংসারে বাঁচবার উপায় আছে?'

সতীশ মায়ের বড়ছেলে, কাজেই বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ওর বিয়ের সম্বন্ধের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। সতীশ বললে, 'রোস মা—হিসেবটা একটু দেখে নিই। এবার যদি পাস করতে পারি তাহ'লে আরও বছরখানেক লাগবে আমার একটা চাকরী পেতে। যদি সরকারী চাকরী পাই ত ভাল—বছর-খানেকের মধ্যে ধরো কন্‌ফার্মেশ্যন্, তারপর ধরো খুচরো-খাচ্‌রা দু'চারটে সখ মিটিয়ে নিতে আরও বছর-খানেক। আর তিনটি বছর। তিন বছর পরেই রেডি ফর ম্যাট্রিমনি! সুড় সুড় করে গিয়ে পিঁড়িতে বসব।'

কিন্তু গোল বাধল একটু পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে। সতীশ ফেল করল, সরকারী চাকরী হ'ল না—অনেক ঘোরাঘুরি ক'রে জুটলো এই সওদাগরী অফিসের সামান্য চাকরী এবং খুচরো সখ মেটানোর জন্যেও আর অপেক্ষা করা চলল না—চাকরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় পিঁড়িতে গিয়ে বসতে হ'ল।

কিন্তু সতীশ কি তাতেই দম্‌ল মনে করেছেন ? মোটেই না। ওর হিসাব এবং পরিকল্পনা পুরোদমেই চলতে লাগল।

প্রথম সন্তান হ'ল মেয়ে। মেয়ে ভূমিষ্ঠ হবার পরের দিনই অফিসের ভূপালবাবুকে ধরে এক বিবাহ-বীমা করে বসল। সন্ধ্যেবেলা এসে আমাকে খবরটা দিয়ে বললে, 'সন্তানের বাপ হওয়া অমনি নয়। ক'টা লোকের সে দায়িত্ব নেবার মত কাণ্ডজ্ঞান আছে। এই ত—মেয়ে হয়েছে অমনি একটা পলিসির ব্যবস্থা করলুম। মেয়েও পনেরো বছরেরটি হবে—বিয়ের টাকাও প্রস্তুত !'

কিন্তু সতীশের সব হিসেবের মতই এটাও বান্‌চাল হয়ে গেল। পরের বছরেই আর একটি মেয়ে হ'ল এবং স্ত্রীকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি। ইন্‌সিওরেন্সের চাঁদা দেওয়া আর সম্ভব হ'ল না। সে পলিসি নষ্ট হয়ে গেল।

সতীশ কিন্তু হাল ছাড়ল না মোটেই। সে দুটো টিনের বড় কৌটো ঝাংঝাল দিয়ে জুড়িয়ে নিয়ে এল—তার ঢাকনায় রইল বড় বড় দুটো ফুটো—পয়সা জমাবার জন্যে। দু মেয়ের দুটো কৌটো। পয়সা জমানোও হ'ল কিছুদিন কিন্তু আবারও একটা বিপদের ঝাপটায় সে কৌটো ভেঙ্গে পয়সা বার করে নিতে হ'ল।

এমনি করেই দিন কাটে সতীশের। বাজেট আর পরিকল্পনা—সে পরিকল্পনার কোনটাই শেষ পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হয় না, বাজেট বান্‌চাল হয় প্রত্যেকবারই। তবু ঐ ওর জীবন, ঐ ওর আনন্দ।

এরই মধ্যেই একদিন হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে ও আবিষ্কার করে, বড় মেয়ে বারো পেরিয়ে তেরোতে পা দিয়েছে।

বার বার সবাইকে বলে সে, 'কী সর্বনাশ ! সময় ত মোটেই নেই !

এখন থেকেই একটা প্ল্যান করা দরকার!—তোমরা ভাই সবাই একদিন বসো—বেশ মাথা খাটিয়ে প্ল্যানটা করতে হবে, কোন ফাঁক না থাকে কোথাও!'

আমরা উড়িয়ে দিই কথাটা, 'সে কী! তেরো বছরের মেয়ে, আজকালকার দিনে ও ত খুকী! এখন থেকে ওর বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হ'লে চলবে কেন?'

'যেমন তোমাদের বুদ্ধি! এখন ওর বিয়ে দিচ্ছে কে? ঠিক ষোলয় ওর বিয়ে দেব। আমিও ওর মাকে যখন বিয়ে করেছি তখন সে ঠিক ষোল। ঐটেই আমি এদেশের পক্ষে মেয়ের বিয়ের আইডিয়্যাল বয়স বলে মনে করি।'

তারপর একটু থেমে পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল বার করলে, "ধরো আর তিন বছর আছে। মাথা গোঁজার জায়গা একটু করেছি কিন্তু এখনও তার দেনা আছে এক গাদা।—এক বছর যাবে সে দেনা শুধতে। তারপর ধরো আর একখানা ঘর করা দরকার, নইলে মেয়ে-জামাই শোবে কোথায়? নিজেরা ত থাকি একখানা ঘরে এই আটটি প্রাণী। তা সেও ধরো আর এক বছর। বাকী থাকে আর একটি বছর—তার মধ্যে মেয়ের গহনা, ফার্নিচার, কাপড়-চোপড়, সব হবে কি? মুস্কিল বাধবে। দশভরি সোনা, খাট-বিছানা ড্রেসিংটেবিল—না, কুলোবে না, আর একটা টিউশনী এখন থেকে বাড়াতে হবে!'

আমরা বললুম, 'আস্ত পাগল একটা!'

কিন্তু সতীশ সত্যিই আর একটা টিউশনী ধরলে। দুটো ত ছিলই, আরও একটা। রাত চারটেয় উঠে গোরুর কাজ বাগানের কাজ ক'রে পুকুরে একটা ডুব দিয়ে ঠিক ছটায় ছেলে পড়াতে যায়। সেখান থেকে ফিরে কোন মতে মুখে দুটো গুঁজেই আটটা তেরোর গাড়ি ধরে অফিস

যায়। অফিস থেকে বেরিয়ে কলকাতাতেই বাকী ছুটো টিউশনী সেরে শিয়ালদা বাজার—সেখানে রাত্রিবেলা বাজার করাই সুবিধা, তা নইলে সময়ই বা কোথা ? অর্থাৎ ফিরতে সেই যার নাম ন-টা দশ ; বাড়ি পৌঁছতে রাত দশটা। কিন্তু তখনই কি আর ছুটি আছে ? গোরু-বাছুর, হিসেব-নিকেশ, ছেলেমেয়েদের অসুখের পর্ব সব সেরে শোওয়া সেই রাত বারোটায়।

তা হোক্। সুবিধের মধ্যে রোগা একহারা চেহারা। খাটতে পারে বেশ, অসুখ বিসুখ হয় কম। এবার আর সতীশ পরিকল্পনা বান্চাল হ'তে দিলে না। বাড়ির দেনা সে শোধ করে ফেললে দশ মাসেই, তারপর আর একখানা ঘর—সেও খুব বেশী সময় লাগল না। আরও মাস দশেকের মধ্যেই, যাকে বলে 'ফিনিশ' হয়ে গেল। তবু ত এটা জামাইয়ের ঘর বলে একটু বেশীই খরচ করেছিল সতীশ। পেটেণ্ট স্টোনের মেঝে, জানলা দরজায় পালিশ, কড়ার বদলে প্লাষ্টিকের হাতল, মায় দেওয়ালে রং পর্যন্ত! আমাদের একদিন চায়ের নেমন্তন্নও করলে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্যে—ঘর-বারান্দা সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে বললে, 'পূজো-আচ্ছা দিতে হয় তাই দিয়ে রাখা, এ ঘর তা বলে এখন থেকে নোংরা করতে দেব না। সেই বিয়ের সময় একেবারে···কেমন হয়েছে বল ? জামাই এসে নাক সিঁটকোবে না ত ?'

নতুন ঘরের দেনাটা শোধ ক'রেই, বোধহয় গৃহপ্রবেশের মাস ছুই পরে শ্রীমান একদিন রাত দশটায় আমার বাড়ি এসে হাজির !

'কী ব্যাপার ?···এত রাত্রে ? হঠাৎ ?···অসুখবিসুখ করেনি ত ?'

'তোর যা বুদ্ধি !' বিরক্ত হয়ে বলে সতীশ, 'এত রাত ছাড়া আমার সময় কখন বল্ দেখি ! সে কথা থাক—এখন্ শোন্ বেশ মন দিয়ে।

একটা ভাল প্ল্যান এসেছে মাথায়। আমাদের সংসার ত তিন ফুটো-ওয়ালা চৌবাচ্ছা। ছেলেবেলার সেই অঙ্ক মনে আছে ত? টাকা জমানো শক্ত শুধু নয়—অসম্ভব। বরং দেনাটা শোধ ক'রে ক'রে অভ্যেস হয়ে গেছে—ওটা ঠিক শোধ হয়ে যাবে। তাই আমি বলছিলুম কি, তুই যদি শ' পাঁচেক টাকা ধার দিতিস তাহ'লে একটা একটা ক'রে গহনা গড়িয়ে, ফার্নিচার কিনে তৈরি হতে পারতুম।'

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—'তার মানে?'

'আরে, এটা বুঝলি না?'···আবারও আমার নির্বুদ্ধিতায় বিরক্ত হয় সতীশ,—'একবার তোর কাছ থেকে দেনা করে একটা জিনিস করলুম, তারপর কিছু কিছু করে যেমন সে দেনা শোধ হ'ল, আর একবার দিলি—আবার শোধ হ'ল—এই ভাবে চলল আর কি?'

'তা না হয় দেওয়া যাবে। কিন্তু ছেলেটেলে কোথাও ঠিক হ'ল?'

'পাগল!' সতীশ হেসে ওঠে, 'ছেলে খোঁজার এখন টাইম কোথায়? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ত কাজে বাঁধা। এদিকটা একটু সামলে নিই, তারপর সন্ধ্যার একটা টিউশনী ছেড়ে দিয়ে ছেলে খুঁজতে বেরোব। সে ঠিক হয়ে যাবে, তার জন্যে ভাবিস না। চেষ্টা করলে আর আগে থেকে প্ল্যান করে কাজে নামলে কী না হয়?'

মাস ছয়েক পরে আর একদিন উল্কার মত অকস্মাৎ এসে হাজির হ'ল সতীশ। হাতে একখানা আসছে বছরের পাঁজি।

ঘরে ঢুকে কোন রকম ভূমিকা না ক'রেই বললে, 'দিন ঠিক করে ফেললুম। এইমাত্র এক বড় পণ্ডিতের কাছ থেকে আসছি। চব্বিশে শ্রাবণ খুব ভাল দিন, আমার খুকীর রাশি নক্ষত্র মিলিয়ে দেখে দিয়েছে। ঐ দিনই ঠিক করে ফেললুম।'

'কিন্তু পাত্র ?'—অবাক্ হয়েই প্রশ্ন করি, 'পাত্র কৈ ?'

'আরে সে ঠিক হয়ে যাবে-খন। এই ত হাতে এখনও সাড়ে পাঁচ মাস সময় রয়েছে। এদিকটাও প্রায় সামলে নিয়েছি। অফিস থেকে আটশ' টাকা ধার পাব, তার মধ্যেই ঘর খরচা বরাভরণ সব সারতে হবে। জামাইকে নগদ একটি পয়সাও দেব না—মনে ক'রে রেখেছি। তবে যদি তেমন তেমন দেখি—দুশো পাঁচশ'র জন্যে ভাল পাত্র হাত-ছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তোরা ত রইলিই!'

ওকে কোন কথা বোঝানো শক্ত, তবু একবার বোঝাবার চেষ্টা করি যে বিয়ের ব্যাপারে পাত্র-পাত্রীটাই মুখ্য। সে দিকে এবার অবহিত হওয়া দরকার।

উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে সতীশ উত্তর দেয় 'ওরে আমি কি তা জানি না। এইবার মন দেব বৈ কি!···সে সব প্ল্যানও ক'রে ফেলেছি! আমার অফিসে আমার স্বজাতি আছে একশ সাঁইত্রিশ জন। তাদের এই লিস্ট আমার পকেটে পকেটে ঘুরছে। ওদের প্রত্যেককে আমি আলাদা আলাদা ধ'রব—কার কোথায় আইবুড়ো আত্মীয় আছে। তাদের নাম, কী করে, কত আয়, বাড়ি-ঘর আছে কিনা, কত দূর পড়েছে—সব ছকে ফেলেছি সাদা কাগজে—সরকারী ফর্মের মত। লিস্ট কমপ্লিট্ হ'লে পড়ে দেখব, যাদের বাদ দেওয়া যায় তাদের নাম কেটে দিয়ে বাকী যারা থাকবে তাদের কাছে এক ধার থেকে, মানে অ আ হিসেবে যাবো, কথা পাড়ব। মেয়ে ত আমার নেহাৎ অপছন্দের নয়—কোথাও না কোথাও লেগে যাবেই। এই ত সোজা হিসেব!'···

হিসেবটা যদিও আমার কাছে খুব সোজা মনে হ'ল না—তবু চুপ ক'রেই রইলাম। দেখা যাক—কী করে। প্ল্যানটা কিন্তু সত্যই মন্দ না।

এর পর উদ্যোগপর্ব চলল দ্রুত গতিতে। খাট বিছানা মায় লেপ-তোষক পর্যন্ত তৈরি করানো হয়ে গেল। প্রত্যেকটি জিনিস সতীশ দাঁড়িয়ে থেকে তৈরি করালে। শাড়ি কেনা বহুদিনই চুকে গেছে, ধুতিও খানকতক কিনে রাখলো। জামার মাপ চাই বলে তৈরি করানো হয়নি কিন্তু গরদ আর আদ্দির কাপড় কেনা আছে। আংটিরও পাথর এবং সোনা প্রস্তুত। এর মধ্যে কোন সাহেবকে ধরে বিলেত থেকে সস্তায় ঘড়ি আনানোর ষড়যন্ত্র চলছে। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে চলছে চব্বিশে শ্রাবণ তারিখটার বিজ্ঞাপন। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবাইকে বার বার শাসাচ্ছে, —'সাবধান, ঐ তারিখটা ছুটি নেওয়া চাই-ই, আমি কিন্তু কোন কথা শুনব না!' মায় মফস্বলেও আত্মীয়দের কাছে চিঠি চলে গেছে, ঐ তারিখটাতে এখানে পৌঁছতে হবে—সে ব্যবস্থা যেন ঠিক থাকে।

আষাঢ় মাসের শেষ রবিবারে দুপুরবেলা ঘামতে ঘামতে এসে আমাকে ঘুম থেকে ঠেলে তুললে,…'আঃ! এখনও তোর দিবানিদ্রার রোগ গেল না! ঐ করে করে সমস্ত জাতটা অকর্মণ্য হতে বসেছে তবু চৈতন্য হয় না।…ওঠ্, যা বলি মন দিয়ে শোন্।

ঘুম ত ঘুম—আরামের আশা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে তটস্থ হয়ে চেয়ারে বসি।

'কী, ব্যাপার কি: এমন অসময়ে হন্তদন্ত হয়ে? কারুর অসুখ বিসুখ—?'

'তোদের ঐ এক কথা! অসুখ আর অসুখ।…অসুখ করবে

কেন? বলছিলুম কি, তোর ভায়রাভাইয়ের কোন্ এক ভগ্নিপতির না ডেকরেশনের ব্যবসা ছিল? তাঁকে ধরে ম্যারাপটা একটু সস্তায় ব্যবস্থা করতে পারিস না?'

'ও হরি! এই ব্যাপার? এই জন্যে অসময়ে ঘুমটা ভাঙ্গালি? তা—সে এখন কি?'

'এখন নইলে আর কবে করব বল্? আর মধ্যে মোটে চারটি রবিবার রইল। সব ত আমাকেই করতে হবে। আমায় কত হিসেব করে চলতে হয় তোরা কি বুঝবি।'

'আচ্ছা দেখি, জিজ্ঞেস করি।' তাড়াতাড়ি উত্তর দিই।

'হ্যাঁ, আর শোন্—তোর ত গান-বাজনার পাড়ায় খুব দহরম-মহরম আছে। সস্তায় একটা ভাল সানাই চাই যে!'

'আচ্ছা, আচ্ছা—সে হবে।'

'উহুঁ—হবে নয়। এখন থেকে চেষ্টা করো। ঐ তারিখটা শ্রাবণ মাসের শেষ দিন। তারপর তিন মাস বিয়ে বন্ধ—খুব ডিম্যাণ্ড হবে ওদের।'

'কিন্তু,—বর?' আসল কথাটা মনে পড়ে যায়।

'বর'···আজ প্রথম সতীশ একটু ইতস্তত করে—'তিনটি আছে আমার চারে। কাকে যে শেষ পর্যন্ত গেঁথে তুলতে পারব তা জানি না। সবাই টাকা চায়, যার খাঁই কম—সে আবার শ্রাবণে রাজি নয়। দেখি, যেটা হয় সামনের দু সপ্তাহের মধ্যেই ঠিক করতে হবে।'

'এখনও হবে? বলিস কি? আসল যেটা'—

'ওরে পাত্র ঠিক ক'রে বেশি দেরি করতে নেই—এটা জেনে রাখিস। তাতে ভাংচি পড়ে!'

এর পরের সাত দিনের মধ্যে আমাকে অন্তত চৌদ্দটা টেলিফোন

করে সতীশ সানাই আর ম্যারাপের ব্যবস্থা ঠিক করিয়ে নিলে। দশ-টাকা আর পাঁচ টাকা বায়না পর্যন্ত হয়ে গেল।

কিন্তু তারপরে একেবারে চুপ-চাপ। সতীশের টিকি পর্যন্ত দেখা গেল না।

ব্যাপার কি ?···সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়ি।···শেষ পর্যন্ত তেইশ তারিখ সন্ধ্যাবেলা স্ত্রী ঠেলে পাঠান,—'যাও একবার, দেখে এসো কী ব্যাপার। হয়ত নেমন্তন্ন করতে ভুলে গেছেন, নয়ত ভেবেছেন ওদের ত বলাই আছে—নতুন ক'রে কী বলব !···তুমি একবার যাও আজ।'

অগত্যা সকাল ক'রে অফিস থেকে এসে বেরিয়ে পড়ি। দুদিন অফিসে টেলিফোন করেছি, পাইনি। চিন্তার কথাই বটে।

ওর বাড়ি পৌঁছে দেখি হুলস্থূল ব্যাপার। ম্যারাপের জন্য এক লরী মাল এসে পৌঁচেছে, তাদেরই সঙ্গে সতীশের দারুণ কেজিয়া। আমাকে দেখে বললে, 'ছ্যাখ দেখি ভাই। মাল বায়না করেছি, ডেলিভারি না নিই বড়জোর বায়নার টাকা মারা যাবে, এ আবার বলে কিনা আরও চব্বিশ টাকা দিতে হবে যাতায়াত লরী ভাড়া! একি মামার বাড়ির আবদার !'

তারা উত্তর দিলে, 'বায়না ত দিয়েছেন মোটে দশ টাকা। কলকাতা থেকে মাল এনেছি, খরচ কত ! সে টাকা কে দেবে !'

তাদের থামিয়ে সতীশকে প্রশ্ন করি,···'ব্যাপার কি ?'

সতীশ বলে, 'একা মানুষ, কত দিক দেখি ! মাছ মিষ্টি সব বায়না দেওয়া ছিল—আমি দুদিন ধরে ছুটোছুটি ক'রে সব বন্ধ করেছি, মায়

পুরুত ঠাকুরকে পর্যন্ত বারণ করে আসতে হ'ল ত! এদের কথাটাই শুধু মনে নেই—আর রসুনচৌকীওলাদের। তা' তারা বলতেই চলে গেল—এরাই বাধিয়েছে গণ্ডগোল!'

'কিন্তু বিয়ের কি হ'ল?'

'ও, তুই শুনিস নি বুঝি?' একটু অপ্রতিভ ভাবে হাসল সতীশ, 'বিয়েটা ঠিক হয়ে উঠল না। মানে সেই তুটো ছেলে—একজনের বড্ড খাঁই, আর বাকী যে—তারা কিছুতে এ মাসে রাজি হ'ল না! ছাখ না এধারে আতান্তর কাণ্ড। তুই বোন লক্ষ্ণৌ আর নাগপুর থেকে এসে হাজির হয়েছে সবসুদ্ধ—কোথায় থাকতে দিই, কী করি তার নেই ঠিক, সেই নতুন ঘরই খুলে দিতে হ'ল শেষ পর্যন্ত। তাও ত মালপত্রে থৈ-থৈ করছে—ভাগ্যিস্ পাশের বাড়ির এঁরা ছিলেন।···রসুনচৌকীর লোকগুলো বুঝি কি ঠাট্টা করেছে—মেয়েটা কেঁদে-কেটে অস্থির। কী যে করি।'

সতীশ বেচারী দেখলুম ভেঙ্গে পড়েছে একেবারে।

ডেকরেটরের লোকটিকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঠাণ্ডা করে সতীশকে বললুম, 'তুই আর দশটা টাকা দে, তাতেই হবে।'

'ও, এই যে,···এখনই দিচ্ছি। বাঁচি তাহলে।'

বুক পকেট থেকে টাকা বার করতে গিয়ে এক গাদা কাগজ-পত্র বার করলে সতীশ, তার মধ্যে নজরে পড়ল একখানা ডাকে-আসা চিঠি, এখনও খাম খোলা হয়নি।

বললুম, 'ও কার চিঠি রে? এখনও খুলিস নি?'

'তাইত, তিন চারদিন আগে এসেছে। খুকী সেই যে পকেটে গুঁজে দিয়েছে, আর মনেও ছিল না। কার যেন চিঠি।'

টাকাটা চুকিয়ে খামখানা ছিঁড়ে ফেললে সতীশ। আমি ওর

কাঁধের পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখে যা বুঝলুম, যে-পাত্রপক্ষ এ মাসে দিতে আগে রাজী হয়নি, তারাই শেষ পর্যন্ত মত বদলে চিঠি দিয়েছিল। চারদিন আগে চিঠি এসেছে, সেদিন খুললে কোন অসুবিধেই হ'ত না।

আজ প্রথম দেখলুম পরাজয়ের ছায়া সতীশের মুখে। দু চোখে ওর জল। তারই মধ্যে একবার হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে, 'ভ্যাখো কাণ্ড!'

মহেশদা'

কলকাতা শহরটা দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে চলেছে শুধু এই জন্য যে, এখনও কোন কোন এমন লোক আছে যারা একটু ফাঁকায় থাকতে চায়, কলকাতার ঘিঞ্জি গলির পচা চাপা দুর্গন্ধ থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। কিন্তু সেই দক্ষিণ উপকণ্ঠেও যে এমন গলি আছে তা কে জানত!

বাস্তবিক সে গলি কলকাতাতেও খুব সুলভ নয়। পুরো ছ' ফুট চওড়া হবে কিনা সন্দেহ—তারই মধ্যে তিনটে বাঁক এবং দুধারের দু' সারি বাড়ির দুটো খোলা নর্দমা। এ ছাড়া মানব-বসতির আরও একটি অঙ্গ, যা জীবনের পক্ষে অপরিহার্য অথচ যার উল্লেখও সভ্য মানুষ প্রাণপণে এড়িয়ে চলতে চায়—বাড়ি-পিছু এমন একটি বা দুটি কক্ষ ত রয়েছেই এবং সেগুলিকে সাফ্ করবার প্রবেশপথও এই গলির দিকে অবারিত হয়ে থাকে অহর্নিশি।

তবু আশ্চর্য, পঙ্কে যেমন পঙ্কজ থাকে—তেমনি এই সংকীর্ণ, নোংরা দুর্গন্ধময় গলিতেই থাকতেন আমাদের মহেশদা'। উজ্জ্বল গৌরবর্ণের বেঁটে-খাটো টাক-চক্চকে মানুষটি, মুখে ও চোখে সর্বদাই একটি শান্ত মিষ্ট কৌতুকের হাসি—পাঁচহাতি ধুতিটি প'রে নিজের অদ্বিতীয় ঘরের চৌকাঠে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, সে গলি দিয়ে যে যেত সে-ই মনে করত মহেশদা' তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যই দাঁড়িয়ে আছেন। আর জানাতেনও প্রত্যেককেই, যাকে দেখতেন তাকেই হাসি-হাসি মুখে প্রশ্ন করতেন—'এই যে ভাই, ভাল? বাড়ির সব খবর ভাল?'

এ গলির অধিকাংশই ভাড়াটে। যে হতভাগ্যদের আয় কম (বা নামমাত্র) অথচ সে আয়টুকু বজায় রাখতে কলকাতার কাছে থাকা প্রয়োজন, তারা না হ'লে এ গলিতে থাকবে কে? যারা মজুরী খাটে না বলে নিম্ন-মধ্যবিত্তদের মধ্যে থাকবার সম্মান পেয়েছে অথচ দিন-মজুরদের চেয়েও যাদের আয় কম, তারাই এই গলির অন্ধকার হাওয়া-বাতাস-হীন বাড়িতে দু'একখানি ঘর ভাড়া ক'রে থেকে প্রাণপণে মৃত্যু ও অস্বাস্থ্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে চলেছে। কিন্তু মহেশদা-ই বোধহয় একমাত্র লোক ও পাড়ায়—যিনি ভাড়াটে নন। এটা তাঁর পৈত্রিক ভিটা।

তাঁর বাবারও এটা পৈত্রিক বাড়ি ছিল। তিন ভাই বলে কর্ত্তা নিজের ভাগে পেয়েছিলেন মাত্র দুটি ঘর ও একটুখানি ফালি জমি। সে সম্পত্তি যখন মহেশদা'দের তিন ভাইকে ভাগ ক'রে নিতে হ'ল—তখন ছোট দু'ভাইকে ঘর দুখানা ছেড়ে মহেশদা' নিলেন সেই ফালি জমিটুকু, এককাঠারও কম। তবে পাড়ার লোকের অনুগ্রহে সেজন্য যৎসামান্য 'ওয়েল্‌টি মণি' পেয়েছিলেন—চারশ' টাকা।

তাতেই এই ঘরটি তোলা সম্ভব হয়েছিল। নইলে সেদিনও তাঁর নিজের আয় থেকে জমিয়ে ঘর করবার মত অবস্থা ছিল না—আজ ত নেই-ই। সেটা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার দিন—জিনিসপত্র সবই সস্তা, তবু ও টাকাটা এতই নগন্য যে পাঁচ ইঞ্চি চওড়া দেওয়াল ও টিনের চালের এই দশ ফুট বাই দশফুট ঘর, চার-পাঁচ রান্না ঘর ও সঙ্কীর্ণতম একটি পাইখানা ক'রে নিতেও সেদিন বেশ কষ্ট হয়েছিল! এসব করে বাড়ির ভেতর দিকে যে স্থানটুকু ছিল, যাকে কোন কবিরও উঠান বলে কল্পনা করতে বাধে—সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় যেন একজন লোকের নিঃশ্বাস নেবার মতও যথেষ্ট বাতাস ওখানে নেই। বোধহয় সেই জন্যেই,

মহেশদা' আমাদের ছুটে ছুটে বাইরে এসে দাঁড়াতেন, তাঁর ঘরের চৌকাঠে। হোক গলি সংকীর্ণ—তবু তাতে বেশি বাতাস আছে!

শুধু যে এর ভেতর হাসিমুখখানি অক্ষয় করে রেখেছিলেন মহেশদা' তাই নয়, এর ভেতর একটুখানি সখও জীইয়ে রেখেছিলেন। তিনি বাঁশী বাজাতেন, এবং ভালই বাজাতেন। খুব ভোরে ঐ গলির অধিবাসীদের ঘুম ভাঙ্গত তাঁর ক্ল্যারিওনেটের সুরে—ভোরবেলা তিনি প্রত্যহ অভ্যাস করতেন। দু'একবার ঐ গলি দিয়ে যাতায়াত করতে করতে আমরাও শুনেছি সে বাঁশীর তান, মনে পড়ে গেছে কবিগুরুর 'বাঁশী' কবিতা—'গলির মোড়ে থাকেন কান্তবাবু, যত্নে পাট করা চুল, সৌখীন মানুষটি!' এজন্য মহেশদা'র খাতিরও ছিল, যাত্রা থিয়েটার হ'লে ডাক পড়ত। পাড়ায় দু'একবার ঐক্যতান সমিতি করবারও চেষ্টা হয়েছে—তার প্রত্যেকটিতেই মহেশদা' ছিলেন। তবে তার দলাদলিতে থাকতেন না কোন দিনই, কেউ এসে ডাকলেই যেতেন, না ডাকলে ঘরে বসে বাঁশী বাজাতেন নয়ত দোরে দাঁড়িয়ে এই গলির পরিচিত অপরিচিত অসংখ্য যাত্রীর দিকে নিজের সহাস্য দৃষ্টি ও মিষ্টভাষা প্রসারিত করে দিতেন।

আশ্চর্য এই যে, এতদিনের এত পরিচিত লোক, যারা প্রয়োজন হ'লেই ওঁকে ডেকে নিয়ে গেছে, নয়ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ ধরে আড্ডা দিয়েছে—দিনের পর দিন, তারা কেউ ভেবে দেখেনি যে ওঁর কিসে চলে। কি করে চলে, কী কাজ করেন, কতটাকা আয়—এ নিয়ে কখনও কেউ মাথা ঘামায়নি। এমন সর্বদা-তুষ্ট ভাব ছিল তাঁর মুখে চোখে, এমন অপরিসীম স্থৈর্য ও প্রশান্তি, এমন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ যে, কেউ কখনও কল্পনা করতে পারতনা মহেশদা'র অর্থাভাব আছে, বা থাকা সম্ভব। বোধহয় সেইজন্যই কখনও কারুর মনে কথাটা জাগেনি।

যেদিন জানলুম সেদিন আমরা সবাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। মহেশদা' লেখাপড়া জানতেন না, সুপারিশ ধরবারও লোক ছিল না কেউ, সুতরাং এক বিলাতী বইয়ের দোকানে বেয়ারার কাজে ভর্তি হয়েছিলেন। মস্তবড় দোকান, আগে মালিক ছিল সাহেব—গত মহাযুদ্ধের আগেই হাত পাল্‌টে এসে পড়ে এক মারোয়াড়ীর হাতে, কিন্তু তাতে অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি বরং অবনতি হয়েছিল। তখন যা মাইনে ছিল নতুন মালিক এসে তা কমিয়ে দিয়েছিলেন, নইলে নাকি কারবার রাখা সম্ভব নয়। সে সময় অনেকেই কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, শুধু মহেশদা' ভরসা পাননি—তখনই তাঁর চারটি ছেলে-মেয়ে। এমন শক্তি বা মুরুব্বি নেই যে অন্যত্র কাজ জুটিয়ে নেবেন। অগত্যা পঁয়ত্রিশ টাকা থেকে কমে পঁচিশ টাকা মাইনেতেই তাঁকে টিকে থাকতে হ'ল।

এসব কথা আমরা কেউ জানিনা। তাঁর কোন অন্তরঙ্গ লোকও বোধহয় জানত না, আত্মীয় ত' কেউ ছিলই না। তাঁর যে ভাই দুটির জন্য অত ত্যাগ করলেন মহেশদা,' তারা বহুদিন আগেই নিজেদের হিস্যা নামমাত্র মূল্যে অপরকে বেচে দিয়ে চলে গেছে। সেখানে এখন মস্ত দোতালা ফ্ল্যাট বাড়ি উঠেছে—তাতে চার ঘর ভাড়াটে। ওঁর দক্ষিণ দিকটা সম্পূর্ণ আবৃত করে সেই বাড়িটি ওঁরই ভ্রাতৃপ্রীতি ঘোষণা করছে।

যাই হোক্—পাড়ার লোক ওঁর অবস্থা সম্বন্ধে প্রথম সচেতন হয়ে উঠল একেবারে ১৩৫০ সালে—মন্বন্তরের বছর। বাজারে চাল ৩৫।৩৬ টাকা মণ হয়ে গেছে! তখনও রেশন হয়নি—দু'একটা কণ্ট্রোলের দোকান হয়েছে বটে, সেখানে রাত বারোটা থেকে লোক জমতে থাকে, লাইন হয় কোন কোন ক্ষেত্রে এক মাইল দেড় মাইল লম্বা—বেলা

আটটা নাগাদ দোর খুলে জন-কতককে একসের ক'রে চাল দিয়েই সে সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়। বাকী চাল কোন্ আশ্চর্য কৌশলে বেরিয়ে গিয়ে কালোবাজারে প্রবেশ করে, তার আর পাত্তা পাওয়া যায় না। যারা পায় তারাও বেশীর ভাগই গৃহস্থ নয়—আবার বিক্রী করার জন্যই অত কষ্ট করে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দাঁড়ানো মহেশদা'র পক্ষে সম্ভব নয়, তাঁর নটায় অফিস, আটটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। এক রবিবার, তা রবিবার অধিকাংশ কণ্ট্রোলের দোকান বন্ধ থাকে। দু'একটি যা খোলা থাকে সেখানে গিয়ে দু'একদিন মহেশদা' বেলা এগারোটা বারোটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে হতাশ হয়ে চলে এসেছেন। ছেলে-মেয়েরাও তখন খুব ছোট, বড়টি বছর-সাতেকের, তাদের পক্ষেও সেখানে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।

সম্ভব হ'ত পাড়ার লঙ্গরখানায় গিয়ে বাজরা মিশনো খিচুড়ী খেয়ে আসা। কিন্তু তা মহেশদা' বা তাঁর স্ত্রী কেউই পারেন নি। পাড়ায় গিয়ে কাউকে অবস্থা জানিয়ে হাত পাততেও পারেন নি। পেরেছেন শুধু দিনের পর দিন উপবাস করতে। তার ফলে যখন স্বামী স্ত্রী ছেলেমেয়ে সকলের চেহারা ভয়াবহ কঙ্কালে পরিণত হয়ে উঠল তখন আমাদের নজরে পড়ল অবস্থাটা। তাও খুব সহজে পড়েনি, কারণ তখন কঙ্কাল দেখে দেখে সবাই অভ্যস্ত। ওটাতে চম্‌কে ওঠবার আর কোন কারণ খুঁজে পেতুম না।

আরও বিপদ এই যে—এই দীর্ঘ উপবাসে, শুধু নিজের নয়, নিজের থেকেও প্রিয় সন্তানদের উপবাসেও—তাঁর মুখের প্রশান্তি ত নষ্ট হয়নি। দেহ শীর্ণ হয়ে গেছে, মুখ হয়ে উঠেছে পাণ্ডুর, বিবর্ণ; গোল মুখখানি লম্বা হয়ে রগ ও গাল ঢুকে বীভৎস হয়ে উঠেছে, তবু সেই শুষ্ক মুখে ও কোটরগত চক্ষুতে হাসির অভাব হয়নি, প্রীতিসম্ভাষণেরও না। কে

বুঝবে বলুন যে অমন নিশ্চিন্তভাবে মিষ্ট করে যে হাসতে পারে আজ হয়ত এক সপ্তাহ সপরিবারে সে উপোষ করে আছে ।

কিন্তু তবু এক সময়ে ওঁদের চেহারাটা এমন অবস্থায় এসে দাঁড়াল যে নজর না পড়ে উপায় রইল না। মহেশদা'কে ভালবাসত অনেকেই, তাদের নিজেদের অবস্থা যতই খারাপ হোক্, নিজেদের আরও বঞ্চিত করে ওঁদের এক মুষ্টি দিতে আটকাল না। এ গলি, ওপাশের গলির সব লোক মিলে একজনের ওপর ভার দিলেন, চাঁদাও উঠল কিছু, কিন্তু সেই টাকাতে বালি এবং হর্লিক্স্ যখন গিয়ে পৌঁছল তখন আর তাঁদের প্রায় কারুরই তা খাবার মত অবস্থা নেই।

তখন আরও মনযোগ গেল সকলকার। ছুটোছুটি ব্যস্ততার সীমা রইল না। অবশেষে একটা য়্যাম্বুলেন্স্ ডেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। বৌদির তখন আর চোখ চাইবার মত অবস্থাও নেই তবু একবার প্রাণপণ চেষ্টায় শুধু বললেন, 'আমাকে আর টানাটানি করছ কেন ভাই, পারো ত ওঁকে আর ছেলেমেয়েগুলোকে বাঁচাও।'

সত্যিই তাঁকে আর টানাটানি করে লাভ হ'ল না। হাসপাতালে অবশ্য চিকিৎসার ত্রুটি হয়নি। তবু বৌদি মারা গেলেন দিন-সাতেক পরেই, আর দুটি ছেলেমেয়ে যমের সঙ্গে যুঝলে প্রাণপণে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরও যেতে হ'ল। শুধু মহেশদা'ই সেরে উঠলেন অনেক কষ্টে, আর বড় ছেলেমেয়ে দুটি।......

মহেশদা' আবার ফিরে এলেন তাঁর সেই একমাত্র ঘরে। স্ত্রী নেই, ছোট ছেলেমেয়ে দুটিও গেছে—নিজেকে রান্না করতে হয়—একবেলা হ'লেও কষ্টকর ত বটেই—তবু তাঁর মুখের হাসি মিলোয় না। এতদিনে জেনেছিলুম যে তাঁর বেতন পঁচিশ টাকা। যমের মুখ থেকে অর্ধেক রফা করে ফিরে আসার পরে সাতটি টাকা মাগ্‌গী ভাতা ব্যবস্থা হয়েছিল

অফিসে—কিন্তু আর তাঁকে উপবাস করিতে না হয় সেদকে এবার আমরা দৃষ্টি রেখেছিলুম। পাড়ায় তখন একটি লোক কালোবাজার ধরে হু-হু ক'রে উঠছে, সেই হঠাৎ-বড়লোকটিকে তাতিয়েই আমরা ওঁর জন্য রাত্রে একটা বাংলা হিসেব রাখার কাজের ব্যবস্থা করেছিলাম—তার জন্য মাইনে পেতেন না, কিছু কিছু চাল পেতেন। তা হোক্, তাতে পেট ভরে।

মহেশদা'র জীবনযাত্রাটা অতঃপর খুব ছন্দোবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভোরে উঠে বাঁশী বাজাতেন (একটু গায়ে বল পাবার পরই ওটা আবার ধরেছিলেন), তারপর উনানে আঁচ দিয়ে রান্না ক'রে নিজে খেয়ে ছেলেমেয়েদের খাইয়ে চলে যেতেন অফিসে। যাবার সময় বাড়িতে চাবি দিয়ে যেতেন—ছেলেমেয়ে দুটো বেলা দশটা পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় খেলে বেড়াত—তারপরে যেত পাড়ার পাঠশালায় পড়তে। ঐখানেই বিনামূল্যে পড়বার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। পাঠশালা থেকে বেরিয়েও তাদের ঐ অবস্থা, কারণ সাড়ে ছটার কম মহেশদা' ফিরতে পারতেন না কোনদিনই—অফিস থেকে বেরিয়ে সারা বাজার ঘুরতে হ'ত, ওরই মধ্যে যদি কোন আনাজ সস্তায় পাওয়া যায় এই আশায়, কিংবা দুচার পয়সায় কোন চুনোমাছ! বাড়ি ফিরে, যেদিন মাছ আনতেন সেদিন শুকনো পাতা-টাতা জ্বেলে সেটা একটু রান্না ক'রে নিতেন, নইলে সকালের জল দেওয়া ভাত নিজেও খেতেন, ছেলে-মেয়েদেরও খাইয়ে দিতেন তখনই। তারপর আবার যেতে হ'ত নতুন চাকরীতে। ঘরে আলো জ্বেলে ছেলেদের পড়তে বসিয়ে, বাইরে থেকে চাবি দিয়ে চলে যেতেন, ফিরে এসে দেখতেন তারা বইয়ের পাশে পড়ে অগাধে ঘুমোচ্ছে। তাদের তুলে নিয়ে বিছানায় শুতে যেতেন। এই

ছিল তাঁর প্রাত্যহিক রুটিন। খালি রবিবার দিনে একটু ব্যতিক্রম হ'ত, দুপুরবেলা ছেলেমেয়েদের নিয়ে আর একটা খালি থলি নিয়ে যেতেন বহুদূরের অপেক্ষাকৃত বৃক্ষবহুল অঞ্চলে, সারা দুপুর ধরে শুকনো পাতা সংগ্রহ ক'রে বেড়াতেন। এতে ইন্ধনের খরচা অনেক ক'মত।

এভাবে যে সুখে ছিলেন না, তা বোধহয় কাউকেই বলবার দরকার নেই। ছেলেমেয়ে দুটো রীতিমত অসভ্য হয়ে উঠছিল, পড়াশুনো ত হচ্ছিলই না। নিজেরও কষ্টের সীমা ছিল না। এ'গলিতে যাঁরা থাকেন তাঁদের নিজেদের অবস্থাই শোচনীয়, সুতরাং তাদের পরোপকারের সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না—এক-আধদিন তবু তাঁরাই প্রাণপণে নিমন্ত্রণ করতেন ;—কেউ কেউ সন্ধ্যাবেলা সামান্য সামান্য রান্নাকরা তরকারী দিয়ে যেতেন। সকালের তরকারী গরমের দিনে প্রায়ই খারাপ হয়ে যেত—শুধু নুন আর তেঁতুল দিয়ে ভাত খাওয়া ছাড়া তখন উপায় থাকত না।

যাঁদের বিনামূল্যে হিতোপদেশ দেওয়া স্বভাব, তাঁরা কেউ কেউ সদুপদেশ দিয়েছেন বৈকি !

'মহেশ, ডাগর দেখে একটি মেয়ে খুঁজে—গরীবের ঘরের মেয়ে, আর একটি সংসার করো। এমন করে আর কতকাল পারবে ?'

মহেশদা' নির্বিরোধ মানুষ, পরের সবকথাতে সায় দেওয়াই তাঁর চিরকালের অভ্যাস, কিন্তু এই একটি ব্যাপারে দেখেছি তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা, তিনি হাতদুটি জোড় করে, সবিনয়ে হলেও বেশ দৃঢ়স্বরে বলতেন, 'ঐটি মাপ করতে হবে দয়াময়, ও কাজ আর না !'

হিতাকাঙ্খীরা হয়ত বোঝাতে চেষ্টা করতেন,—'কিন্তু একা মানুষ ছেলেমেয়ে দুটোর কথাও ত ভাবতে হবে ? ও দুটো যে বাঁদর তৈরী হচ্ছে !'

'তা হোক প্রভু—তবু ত বেঁচে আছে। মুখে ত দুটো ভাত দিতে পারছি, ঐ আমার ঢের। মানুষ না হয় মোট বয়ে খাবে, সেও ভাল। আবার একজনকে ঘরে এনে তাঁকে শুকিয়ে রাখব, ছেলেমেয়েগুলোও উপোষ করবে—সেটা আর ইচ্ছা ক'রে হ'তে দেব না।'

এইভাবেই যখন একবছর, এমন কি তিনবছরও কেটে গেল, তখন আমরা ও নিয়ে চিন্তা করাও ছেড়ে দিলুম। মহেশদা' আর সংসার করবেন না—এটা সকলকারই একরকম বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে গেল। হিতাকাঙ্খীরাও সদুপদেশ দেওয়া ছেড়ে দিলেন। এমন সময়ে ঐই এক অঘটন—

পূর্ববঙ্গে গোলমালের ফলে অকস্মাৎ তখন লোক আমদানী শুরু হয়েছে। পথ ঘাট ভরে গেছে আশ্রয়-প্রার্থীতে, শিবিরে শিবিরে লোক উপ্‌ছে উঠেছে, সরকারী বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠানই পেরে উঠছে না সামলাতে—এমন অবস্থা। তার ঢেউ কিছু এ গলিতেও এসে পৌঁচেছে বৈকি! আত্মীয়তার সুদূরতম সূত্র ধরে লোক এসে উঠছে প্রত্যহ। একখানি ঘরের অধিবাসীর সংখ্যা সতেরতে এসে ঠেকেছে। তারা দিনের বেলা বাইরে বাইরে কাটায়, রাত্রে কোনমতে এসে শোয়। তবু এখনও লোক বেড়েই চলেছে—তাদের আশ্রয় আর আহার কোনমতেই বুঝি জোটানো যায় না।

এইভাবেই মালতী আর মালতীর মা একদা এ পাড়ায় এসে পৌঁছলেন। নোয়াখালীতে বাড়ি, সেখানেও অবস্থা ভাল ছিল না, এখানে এসেছেন একেবারেই নিঃস্ব হয়ে। দূর সম্পর্কের এক ভাইয়ের ঠিকানা ভরসা করে এসেছিলেন, তিনি বহুদিন এ পাড়া থেকে চলে গিয়েছেন, কোথায় গিয়েছেন সে খোঁজ কেউই রাখে না। কোন্ অফিসে কী কাজ করেন তাও মালতীর মা জানেন না।



সুতরাং একেবারে রাস্তায় দাঁড়াবারই কথা। রাস্তাতে কাটল তাঁদের সারাদিন। মালতীর মা কেবলই কাঁদেন। মালতী কাঠ হয়ে বসে রইল। এমন অবস্থাতে পাড়ার লোকেরও স্থির থাকা কঠিন। সকলে গিয়ে সেই হঠাৎ-বড়লোক দেবীদাসবাবুর শরণাপন্ন হলেন। ব্রাহ্মণের মেয়ে শুনে দেবীদাসবাবু আশ্রয় দিতে রাজী হলেন। কথা হ'ল যে উনি মাতা কন্যা দুজনকেই খেতে ও থাকতে দেবেন—কিন্তু মাইনে বলে কিছু দেবেন না। কারণ তাঁর একটি লোকেরই দরকার ছিল, দুটি লোককে পুষতে হ'লে আর পেরে উঠবেন কি করে?···মালতীর মা এই সর্তেই যেন হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলেন।

এখানে থাকতে থাকতে ক্রমশ মালতীর মার সঙ্গে সকলকারই পরিচয় হ'ল। বেশ মানুষটি। হাসিখুশী, সদালাপী, সরল। কিন্তু মালতীর জন্যই তাঁর মনে শান্তি নেই। মেয়েটির বয়স বাইশ-তেইশের কম নয়। ওর মাও তা গোপন করেন না। বলেন, 'ঠিক হিসাব ত নাই—তা এক কুড়ির কম না।' শ্যামবর্ণ, শ্রীহীন মেয়ে, তার ওপর একটি পা খোঁড়া। এ মেয়ে পার হওয়া কঠিন! বিশেষত, সহায় সম্বল নেই যখন কোন রকমই। মালতীর মাও সে আশা করেন না —শুধু কাঁদেন হাউ হাউ ক'রে প্রসঙ্গটা উঠলেই।

কিন্তু কী করে কি হ'ল, দেবীদাসবাবুর প্রসন্ন দৃষ্টি পড়ল মেয়েটির ওপর। বোধহয় ও ভূতের মত খাটত বলেই। সংসারের সকলের সেবা করতে পারলেই যেন মালতীর জীবন সার্থক হয়, তাকে কেউ হুকুম না করলে তার ক্ষোভের কারণ ঘটে। মালতীর মাও নিজের মত করেই তাঁর সংসারে খাটেন—সেজন্যও কৃতজ্ঞতার কারণ ছিল দেবীদাস বাবুর। এই বাজারে ত্রিশটাকার কম একটা রাঁধুনী পাওয়া যায় না —তিনি বিনা বেতনে দুটি লোক পেয়েছেন।

তা ছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা, দেবীদাসবাবুর তখন চালে, কাপড়ে, ঔষধে, লোহায়, সিমেণ্টে ভাগ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কালো বাজারের হলদে সোনা তাল হয়ে উঠছে সিন্দুকে। জমি আর বাড়ি নিত্য কিনছেন একটা না একটা। একদা খোস্‌মেজাজে তিনি বলে ফেললেন, 'মালতীর একটা সম্বন্ধ দেখুন। দু'গাছা বালা, কানের একটা কিছু—আর দানের বাসন-কোসন, বরকন্যের জামা-কাপড় ঘর-খরচা সব আমি দেব। বরযাত্রীও খাওয়াবো কিছু! এতে যদি পাত্র পান ত আপত্তি নেই। নগদ টাকা দেব না, কিংবা আর গয়নাও দিতে পারব না।'

পাড়ার তিন চারটি উৎসাহী তরুণ খুঁজে খুঁজে একটি পাত্র জুটিয়েও ফেললে। কোন্ এক কারখানায় কাজ করে। একটি পক্ষ সম্প্রতি গত হয়েছে, তবে ছেলেপুলে বেশী নেই—একটি। বিড়ি ছাড়া অন্য কোন নেশা নেই—নিজের একটা মাটির বাড়িও আছে। সেইখানেই দেখাদেখি হয়ে কথা পাকা হয়ে গেল। বিয়ের দিনও ধার্য হয়ে গেল।

দেবীদাসবাবু শুধু বরযাত্রী নয়—কন্যাযাত্রী হিসেবে পাড়ার দুচার জনকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন। মহেশদা'কেও বাদ দেননি, কারণ ওঁকে হাত পুড়িয়ে খেতে হয় বলে সুযোগ সুবিধা পেলেই ওঁকে সকলে নিমন্ত্রণ করত। আর যারা এ বিয়েতে উৎসাহী, তাদেরও বলা হয়েছিল।

গহনা এসেছে, কাপড় এসেছে—দান-সামগ্রীও তৈরী। বধূবেশে সেজে বসে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে মালতী। রূপ ও রূপো—দুটোরই দৈন্য তার, কে জানে শ্বশুর ঘরের লোক কেমন ভাবে তাকে নেবে। ওর মায়ের চোখেও জল; এমন আনন্দের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই—এজন্য সকলেই বার বার তাঁকে তিরস্কার করছে, তবু তিনি

নিজেকে সামলাতে পারছেন না।

লগ্ন ছিল সাতটায়। সন্ধ্যার মধ্যেই বরের এসে পড়বার কথা। কিন্তু সাতটা বেজে গেল, সাড়ে সাতটা বেজে গেল—তবু দেখা নেই। পূর্ববঙ্গের প্রথানুযায়ী বরকে আনতে লোক গিয়েছিল, সেও ফেরে না। সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। দেবীদাসবাবু সাইকেল ক'রে আর একজনকে পাঠালেন।···ভাগ্যে শেষরাত্রে আর একটা লগ্ন আছে—

রাত নটা নাগাদ যখন সকলেরই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে এসেছে, কনে পিঁড়ির ওপরই উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে এবং মা মাথা খুঁড়ছেন, তখন সে ছেলেতুটি ফিরল। ম্লান মুখ···মাথা হেঁট ক'রে এসে দাঁড়াল।

'কী হে, কী ব্যাপার? বর কই?'···সহস্র প্রশ্ন চারদিক থেকে।

প্রথমত তারা উত্তরই দিতে পারে না। অবশেষে যা বললে তার মর্মার্থ হ'ল এই—মালতীদের কোন আত্মীয় তাদের ভার নিতে খোঁজ ক'রে এগিয়ে না এলেও, ইতিমধ্যে তাদেরই কে খোঁজ ক'রে বরের বাড়ি জানিয়ে এসেছে যে ও মেয়েকে গুণ্ডাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সাতদিন পরে তাকে উদ্ধার করা হয়। তাতেই বর আর রাজী নয়। ব্রাহ্মণের ঘর, তায় গরীব—ও মেয়ে এনে কি ফ্যাসাদে পড়বে সে? যদি এক-ঘরে করে সবাই? তা ছাড়া সে-ই বা ওকে নিয়ে ঘর করবে কেমন ক'রে জেনে শুনে?···ছেলেরা অনেক বুঝিয়েছে, তার পায়ে পর্যন্ত ধরেছে, এতক্ষণ ধরে অনুনয়-বিনয়ের চুড়ান্ত করে দিয়েছে, কিন্তু কোনই ফল হয়নি। তার ঐ এক কথা, 'না চেহারা ভাল, না পাচ্ছি পয়সা —তবে কিসের জন্য জেনেশুনে এ কাজ করব বলুন?'

শুনে আমরা সকলেই স্তম্ভিত। কিছুক্ষণ একটা নিশ্ছিদ্র নীরবতা চারিদিকে। তারপর দেবীদাসবাবু মালতীর মাকে প্রশ্ন করলেন, 'এ কথা কি ঠিক?'

তিনি ঘাড় হেঁট করে বললেন, 'মিছা কথা ত বলি নাই কখনও, কথা ঠিকই। তবে উয়ার দোষ কি বাবু?···তা ছাড়া অর দেহটা ত নষ্ট হয় নাই।'

দেবীদাসবাবু ক্ষেপে গেলেন যেন, 'মিছা কথা ত বলি নাই! ন্যাকা!···তবে এতদিন এ কথা গোপন করেছিলে কেন? আমার জাত মারলে কেন? ঐ মেয়ের হাতে আমি ভাত পর্যন্ত খেয়েছি।··· যখন বিয়ের সম্বন্ধ করছি তখন বলোনি কেন? মিছিমিছি আমি ত এমন অপমানিত হতুম না তাহ'লে!'

তিনি অকথ্য গালাগাল দিতে লাগলেন।

আমরা কী বা বলব।—ওঁদের এই গোপন করাটা, সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের কারুরই ভাল লাগেনি।

হঠাৎ মহেশদা' এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'দেবীদা, একটা কথা বলব?'

'কী বলুন। আমার মশাই এখন মাথার ঠিক নেই।'

'আপনারা ত দোজবরে দিচ্ছিলেনই—যদি আপত্তি না থাকে ত আমাকে দিন, আমি বিবাহ করতে প্রস্তুত আছি।'

'সে কি!···এই সব জেনেও আপনি নেবেন?'

'হ্যাঁ—আমার কোন আপত্তি নেই। যদি ওঁদের থাকে ত সে কথা আলাদা। তবে একটা কথা, ওর মাকে জানিয়ে দিন, আমি বড়ই গরীব, আমার ঘরে এলে হয়ত সবদিন পেট পুরে খেতে দিতে পারব না। কিন্তু উপবাস করলেও সসম্মানে থাকবে!'

আবারও কিছুক্ষণ তেমনি নীরবতা চারিদিকে।

'ছাখো মহেশ, ঝোঁকের মাথায় একটা কিছু করে ব'সো না। ভাল ক'রে ভেবে ছাখো।'

'আমি ত ঝোঁকের মাথায় কিছু করি না দেবীদা, ভেবেই দেখেছি।'

আমরা তখন সকলেই তেতে উঠেছি। অপরে সৎসাহস দেখালে বাহবা দেওয়া সহজ। আমরা সবাই মহেশদা'কে অভিনন্দিত করলাম।

সেইদিনই শেষরাত্রের লগ্নে মালতীর সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়ে গেল।

মহেশদা' তেমনিই আছেন। ভোরে উঠে বাঁশী বাজান। তেমনি অবসর সময়ে দাঁড়িয়ে থাকেন পাঁচি ধুতিখানি পরে রাস্তার দিকে সহাস্যমুখ ও হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে। একটুকু বদলাননি ভদ্রলোক।

ফলাফল

পরীক্ষায় পাস করার খবর পেয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষক-ছাত্র দুজনকারই বিষাদের কারণ ঘটে। এ বছরের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার খবর পেয়ে হরিশবাবু আর শান্তিরও সেই অবস্থা হ'ল।

হরিশবাবু পায়ে একটা ফোড়া হয়ে ক'দিন স্কুলে যেতে পারেননি। পরীক্ষার ফল যে এই শনিবারে বেরোবে তাও জানতেন না। তিনি এম্‌নি শান্তিকে পাঠিয়েছিলেন ওঁদের ইস্কুলের নীতীনবাবুর বাড়ি—কোন খবর তিনি পেয়েছেন কিনা এবং সাধারণভাবে কবে খবর বেরোবে তাই জানতে। নীতীনবাবু শিক্ষক হিসাবে অত্যন্ত জনপ্রিয় শুধু যে তাই নন্—প্রতিপত্তিশালীও বটে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এত কড়াকড়ি না হ'লে কবে তিনি ফলাফল বার ক'রে আনতেন; এখনও অন্তত দু'একদিন আগে যে আনতে পারেন না তা নয়।

নীতীনবাবু অবশ্য আশার অতিরিক্ত খবরই দিয়েছেন। অর্থাৎ একেবারে ছাপা লিষ্ট একখানি হাতে দিয়েছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, যতদূর জানা গেছে শান্তি দ্বাদশ স্থান অধিকার করেছে। যে ছেলেটি দশম হয়েছে তার চেয়ে মাত্র সাত নম্বর কম পেয়ে। আর মাত্র আটটি নম্বর বেশি তুললেই শান্তি দশম হতে পারত। খবরের কাগজে কাগজে ওর নাম উঠত।

দুজনেই চুপ করে রইলেন। এ খবর অন্তত হরিশবাবুর কাছে অপ্রত্যাশিত। শান্তির সম্বন্ধে আশা ছিল তাঁর খুব বেশি। প্রথম

হওয়াও বিচিত্র নয়—অন্তত দ্বিতীয় কি তৃতীয় সে হবেই। সেই শান্তি হল টুয়েল্‌ফ্‌থ!

শান্তি ওঁরই প্রায়ান্ধকার ঘরের জানলায় চুপ করে বসেছিল মাথা হেঁট করে। সে জানত হরিশবাবুর মনের অবস্থা, সে জন্য সে নিজেকে অপরাধীই মনে করছিল। সে এসে ওঁর হাতে চিঠিটি দিয়েই মাথা হেঁট করেছে—একটা কথাও বলেনি। হরিশবাবুও বলেননি অবশ্য—ওর দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিলেন স্থির হয়ে। ওঘরে হরিশবাবুর একটা মেয়ে কেঁদে যাচ্ছে একটানা, নাকিস্সুরে, আর ওঁর স্ত্রী ঘুমোচ্ছেন, তারই চাপা একটা নাক ডাকার শব্দ—এই দুই শব্দ ছাড়া কোথাও যেন কোন প্রাণ-লক্ষণ পর্যন্ত নেই। এঘরে নিশ্বাস ফেলার শব্দও শোনা যাচ্ছে না, হরিশবাবু যেন আশাভঙ্গের দীর্ঘ নিশ্বাসটাও ফেলতে ভুলে গেছেন।

অনেকক্ষণ দু'জনেই এমনি বসে রইলেন, তারপর অকস্মাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল হরিশবাবুর,—'আর আমাদের নিমু? সে কোন্ ডিভিশ্যানে গেল?'

শান্তি মাথাটা আরও হেঁট করলে মাত্র, উত্তর দিল না।

'কী, কথা কইছ না যে! ওর কি হ'ল? আরে, আমি ত দেখতেই ভুলে গেছি। কত যেন নম্বর ওর? ক্যাল থ্রি এইট···কত যেন?'

'আমি দেখেছি স্যার। নিমুর রোল নেই ও শীটে। ও ফেল করেছে।'

'নিমুর রোল নেই? ফেল করেছে? কী সর্বনাশ!'

হরিশবাবু অনুভব করলেন একটা শৈত্য যেন ওঁর মেরুদণ্ড বেয়ে নিচের দিকে নামছে। সে শৈত্য যেন ওঁর সমস্ত অনুভূতিকেও আচ্ছন্ন করবে। এ ঘর এম্‌নিই ঠাণ্ডা, বোধ হয় এক শতাব্দীরও বেশী সূর্য-

কিরণ ঢোকেনি এ ঘরে, তবু—এত ঠাণ্ডা ত কোনদিন হরিশবাবু অনুভব করেননি।

কিছুক্ষণ বিহ্বলভাবে বসে থেকে আর একবার বলে উঠলেন, 'কী সর্বনাশ!'

এ বিহ্বলতার কারণ ছিল বৈকি!

কিন্তু তার আগে শান্তির ইতিহাসটা জানা দরকার।

শান্তিকে হরিশবাবু বলতে গেলে পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। একটা প্রভাতী টিউশানী শেষ করে দ্রুতপদে আর একটায় চলেছেন, হঠাৎ আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটা সরু গলি থেকে ছেলেটি বেরিয়ে এসে সামনেই ওঁকে পেয়ে বলেছিল, 'মার তিনচার দিন বাড়াবাড়ি অসুখ—ঘরে কিছু নেই। ওষুধ-পথ্যি কিছু কিনতে পাচ্ছি না—কিছু সাহায্য করবেন?

কথা বলার ভঙ্গীতে হয়ত এমন কিছু ছিল, কিংবা ওর সুশ্রী সরল মুখে ছিল সত্যের জ্যোতি, কিংবা ওঁরই ইস্কুলমাস্টারী করা সরল নির্বোধ মন, হরিশবাবু থম্‌কে দাঁড়িয়েছিলেন। কলকাতার রাস্তায় এমন ত কতই আবেদন কানে এসে পৌঁছয় প্রত্যহ—কে-বা দাঁড়ায়, কে-বা সাহায্য করে। কারুর হাতের কাছে খুচরো পয়সা থাকলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় হয়ত—থম্‌কে দাঁড়িয়ে কেউ চেয়ে দেখে না।

হরিশবাবু কিন্তু দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'চল ত যাই। দেখি তোমার মায়ের কি হয়েছে।'

ছেলেটির এতে সরে পড়বার কথা। অন্য ক্ষেত্রে হয়ত তাই হ'ত। কিন্তু এ সাগ্রহে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সংকীর্ণ গলির মধ্যে খোলার ঘরের বস্তি। তারই একটি পেছনের ঘরে মেঝেতে ছেঁড়া কাঁথায়

শুয়ে ওর মা জ্বরে অচৈতন্য। প্রতিবেশীদের কাছে সব খবর পাওয়া গেল, ওকেও জেরা ক'রে কতক জানা গেল। নদীয়া-সীমান্তে ওদের বাড়ি, পাকিস্থান হওয়াতে কিছুদিন আগে ওরা চলে আসে কলকাতায়। সেখানেও অবস্থা ভাল ছিল না, ইস্কুলে ফ্রি পড়ত ছেলেটি, পাঁচ জনের দয়ায় এবং তিন বিঘা মাত্র জমির ফসলে দিন চল্‌ত। সবাই যখন চলে এল তখন আর সেই তিন বিঘায় বরাত দিয়ে বসে থাকা চলল না। ওরাও মায়ে-পোয়ে চলে এল এবং সামান্য-যা এনেছিল সঙ্গে, তাইতে এখানে ঘর ভাড়া করলে পরিচিত লোকের সাহায্যে।...ওরা ব্রাহ্মণ, তাই রাঁধুনীর কাজের অভাব হ'ল না। আজ পাঁচ ছ' মাস এইভাবেই চলছে। একই বাড়িতে ছ'ঘরের রান্না করে—যা পায় তাতে অতিকষ্টে ছ'টি পেট মাত্র চলে, ছেলেকে লেখাপড়া শেখানো চলে না। সুতরাং শান্তি বসেই আছে, আর কোন দোকানে-টোকানে কাজ মেলে কিনা তারই চেষ্টা করছে।

মা জ্বরে অজ্ঞান, ছেলেটির মুখ শুকনো, বোধ হয় ক-দিন খাওয়া হয়নি—তবু হরিশবাবুর অন্তরবাসী ইস্কুলমাস্টারের কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল। তিনি সব ভুলে প্রশ্ন করলেন, 'কেমন ছাত্র ছিলে তুমি? কত হ'তে ক্লাসের মধ্যে?'

অত দুঃখেও ছেলেটির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে বললে, 'আমি ওখানে বরাবরই ফার্স্ট হতুম।'

'ফার্স্ট হ'তে? কেমন ক'রে জানব আমি? কোন সার্টিফিকেট আছে?'

ছেলেটি ছুটে গেল ঘরের কোণে। একমাত্র ছোট্ট লোহার সুটকেসের মধ্যে থেকে বিবর্ণ ভাঁজ করা একটা কাগজ বার করে দেখালে, ওখানকার হেডমাষ্টার স্বেচ্ছায় সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছেন

যে, কোন স্কুল যদি দয়া করে এই শান্তিময় চক্রবর্তীকে ভর্তি করে নেন্ ত এ ছেলেটি সে স্কুলের গৌরব বৃদ্ধি করতে পারবে। পাঁচ বৎসর তাঁর ইস্কুলে পড়েছে, কখনও দ্বিতীয় হয়নি।…অর্থাৎ বরাবরই প্রথম হয়েছে।

হরিশবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এইবার তিনি রোগিণীর দিকে নজর দিলেন। প্রশ্ন করলেন, 'কাছাকাছি কোন ডাক্তার আছে?'

'আছেন। এই মোড়েই।'

'চল ত ডেকে আনি।'

ডাক্তার এসে বললে, 'নিউমোনিয়া, বাঁচবার আশা কম। এখনই হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয়ত কোন উপায় হতে পারে। এখানে থাকলে কিছুতেই বাঁচবে না'। সব কথা শুনে বললেন, 'ক্যাম্বেলে আমার একটু হাত আছে, চিঠি লিখে দিচ্ছি সেখানে নিয়ে যান।'

সেদিন হরিশবাবুর আর ইস্কুল হয়নি। বরং দশটি টাকা ধার ক'রে ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে শান্তির মাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন, ওষুধ ফল কিনে দিয়েছিলেম এবং গৃহিণীর বিরক্তির কিছুমাত্র ভয় না করে শান্তিকে নিজের বাড়িতে এনেছিলেন।

বলা বাহুল্য, শান্তির মা বাঁচেনি। তারপর শান্তিকে নিয়ে হরিশবাবু পড়লেন মহা ফাঁপরে। মাস্টার মশাই এবং ছাত্ররা মিলে ওর মার দাহ বা শ্রাদ্ধের খরচা তুলে দিয়েছিলেন চাঁদা করে। হেড-মাস্টার মশাই বললেন, 'ফ্রিতে ভর্তি ক'রে নিচ্ছি আমি এখনই। ক্লাস এইটে উঠে চলে এসেছিল, আমিও ক্লাস এইটে ভর্তি করে নিচ্ছি না হয়, ভাল ছেলে মেক-আপ করে নেবে। বড় জোর ফ্রি কোচিং-এর ব্যবস্থা করে দিতে পারি। বোর্ডিং ত নেই,—তাহলেও না হয় সে চেষ্টা করতুম। আর কি করতে পারি বলুন?'

সত্যিই ত, তিনিই বা কি করতে পারেন! মাইনে পান বটে শ' আড়াই—গোটা দুই ভারি টিউশ্যানী এবং পাঠ্য-পুস্তকের আয়ে সেটা শ' পাঁচেক হয়, তবে তিনিও ছাপোষা লোক, বাড়িভাড়া দিয়ে বাস করতে হয় কলকাতায়।

কিন্তু হরিশবাবুর অবস্থা যে আরও শোচনীয়। বৌবাজারের বোধ হয় সংকীর্ণতম গলির মধ্যে নিচের তলার এই দুটি ঘর। এত অন্ধকার যে দিনেও আলো জ্বালা প্রয়োজন, সকাল বিকেল জ্বালতেও হয় কিন্তু দুপুরে শুধু পয়সার অভাবেই নেভানো থাকে। বি-এ ফেল ক'রে ইস্কুল মাস্টারীতে ঢুকেছিলেন। তারপর নিজের চেষ্টায় পড়ানোয় খুব নাম করেছেন, ওপরের ক্লাসেও অঙ্ক ভূগোল পড়ান কিন্তু পদবীতে এখনও কনিষ্ঠ হয়ে আছেন। মাইনে শোচনীয়। এতদিনে পঁচাশি—ভাতা-টাতা নিয়ে যা হয় তাতে দশদিনের খরচ কুলোয় না। বোমার হিড়িকে যখন সবাই পালায় তখন একপঞ্চমাংশ বেতন নিতে হয়েছিল, তারপরই পঞ্চাশের মন্বন্তর, চল্লিশ টাকা ষাট টাকা করে চাল কিনতে হ'ল—কোথাও কোন সঞ্চয়, এমন কি গৃহিণীর গায়ে একরত্তি সোনাও নেই। উদয়াস্ত টিউশ্যানী করে ও কোচিং ক্লাস নিয়ে কোনমতে সংসার চালাতে হয়। তিনটি ছেলে ও দুটি মেয়ে, চারটি তার মধ্যে ইস্কুলে পড়ে। সুতরাং তার মধ্যে পরের ছেলেকে একদিনও আশ্রয় দেওয়া কি খেতে দেওয়া অসম্ভব।

অনেক ভেবে হরিশবাবু একটা উপায় স্থির করলেন!

নিমুও ক্লাস এইটে পড়ে। নিমু তাঁর প্রাইভেট ছাত্র। ওদের অবস্থা ভাল, বাপের কি একটা বড় কারবার আছে। ওরা ব্রাহ্মণ নয়—সেইজন্য ব্রাহ্মণে ভক্তিও আছে। বামুনের ছেলের উপকার হয়ত আনন্দের সঙ্গেই করতে রাজী হবে। হরিশবাবু সেদিন ভোরবেলা

উঠে গিয়ে নিমুর বাবার সঙ্গে দেখা করলেন। সব ইতিহাস খুলে বললেন, ওদের দেশের ইস্কুলের হেডমাস্টার মশাইয়ের লেখা সেই সার্টিফিকেট দেখালেন,...ওঁরা যে ফ্রি ভর্তি করে নিয়েছেন সে কথাও বললেন।

'এখন আপনি যদি দয়া করে ওকে দুটি অন্ন আর একটু আশ্রয় দেন!'

নিমুর বাবা বললেন, 'বেশ ত। এর আর কথা কি। ভাল ছেলে বলছেন, ব্রাহ্মণ—আমার দ্বারা যদি ওর আখেরের একটা ব্যবস্থা হয় ত হোক্ না। নিমুর সঙ্গেই পড়ে বলছেন না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—ঐ এক সেক্শনেই পড়ে আবার।'

'বেশ তা'হলে এখানেই পাঠিয়ে দিন। দুটিতে থাকবে, একসঙ্গে পড়া-শুনাও করবে। নিমুর একটা ভাল সঙ্গী হয় তাই আমি চাই!'

হরিশবাবু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

•

তারপর এই আড়াই বছর কেটে গেছে। শান্তির জন্য ভাবতে হয়নি ওঁকে।

শান্তি হয়ত সম্পূর্ণ অসম অবস্থার এই সহপাঠীর বাড়ি কিছু অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবে, এ আশঙ্কা ছিল হরিশবাবুর কিন্তু এত দ্রুত ওদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জমে উঠল যে, উনি অবাকই হয়ে গেলেন বরং। কোন দিকেই মিল নেই ওদের, নিমু লম্বা-চওড়া কালো চেহারার বলিষ্ঠ ছেলে, শান্তি ফরসা রোগা নরম ধরণের। নিমু খায় বেশি, সিনেমা দেখে আরও বেশি—পড়ার চেয়ে খেলাধুলায় বেশি অনুরাগী। শান্তির বই হাতে পেলে খাওয়ার কথা মনে থাকে না, সিনেমা যেতে আদৌ

ভাল লাগেনা ওর। নিমু একটু বেশি কথা বলে—শান্তি নিস্তব্ধ চিন্তাশীল ছেলে। অর্থাৎ একেবারেই বিপরীত। তবু ওদের যে এমন আন্তরিক সৌহার্দ কী করে গড়ে উঠল তা হরিশবাবু ভেবেও পেলেন না।

প্রথমে শান্তি আশ্রয় পেয়েছিল বাইরের বাড়ির নীচেতলার একটি ঘরে। কোনক্রমেই সে ওপরে উঠবে না এই ছিল তার প্রতিজ্ঞা—নিমু জোর-জবরদস্তি করে শেষ পর্যন্ত একবেলা না খেয়ে ওকে রাজী করালো। নিমুর নিজের ঘরে খাটের পাশে একটা তক্তাপোষ পড়ল—কিন্তু পরে দেখা গেল সেটাও অতিরিক্ত, শান্তি বেশির ভাগ নিমুর বিছানাতেই শোয়। দুজনে শুতে কষ্ট হয়, তবু পড়তে পড়তে রাত্রে যখন চোখ বুজে আসে তখন সেইখানেই বই খাতার মধ্যে দুজনে ঘুমিয়ে পড়ে।

অবশ্য নিমুর জোরই যে সর্বত্র খেটেছিল তাও নয়। নিমু ইস্কুলে আসত গাড়িতে। শান্তি যখন কিছুতেই গাড়ি চড়তে রাজী হ'লনা, তখন নিমুও গাড়ি ছেড়ে দিলে। নিমুর মা ঘোরতর আপত্তি করেছিলেন কিন্তু নিমুর বাবা বুঝিয়ে বলে তাঁকে রাজী করালেন, 'এইটুকু ত পথ—দুজনে হেঁটেই যাক্।' সিনেমা দেখা অনেক কমে গিয়েছিল নিমুর—তার বদলে শান্তিকেও দু-একদিন খেলার মাঠে যেতে হয়েছিল।

আর কয়েকটি প্রসাদলোভী সহপাঠীর চক্রান্তে নিমু ক্লাস নাইনে উঠেই সিগারেট ধরেছিল, কিন্তু শান্তির নিঃশব্দ অসহযোগে ছাড়তে বাধ্য হ'ল সে, ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে শান্তিকে শান্ত ক'রে তবে সে যেন বাঁচল।

এম্‌নি ক'রে শান্তির প্রভাব নিমুর জীবনে শুভ ফলই বহন ক'রে এনেছিল। কিন্তু হরিশবাবুর কেমন সন্দেহ হয় যে এই যোগাযোগটা

না হলেই ভাল হ'ত। নিমুর সঙ্গে বন্ধুত্ব—শান্তির পক্ষে ঠিক শুভ হয়নি।

আজও শান্তির দিকে তাকিয়ে হরিশবাবু সেই কথাই ভাবছিলেন। শান্তি যে ওঁদের ইস্কুলে বরাবর প্রথম হয়ে গেছে সেটাই বড় কথা নয় —এত দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতা ক'রে হরিশবাবুর মোটামুটি ছেলে চেনরার ক্ষমতা কিছু হয়েছে—শান্তি বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রথম হবার মত ছেলে। যেভাবে ও টেস্ট্ দিয়েছে তাতেও তাই বোঝায়, খুব কড়া ক'রে খাতা দেখেও সব বিষয়ে শতকরা নব্বুয়ের ওপর নম্বর ছিল। এ-কী হ'ল ? এ কি নিমুর প্রভাব ?

কিন্তু নিমু যে ফেল্ করবে এটা তিনি একবারও ভাবেন নি।

তিনি আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ ও নতমুখে শান্তির দিকে চেয়ে থেকে আবারও বললেন, 'কী সর্বনাশ।'

নিমুর বাবার কাছে তিনি মুখ দেখাবেন কি ক'রে? তিনি পড়িয়েছেন, তাঁরই অনুরোধে শান্তিকে ওঁরা আশ্রয় দিয়েছেন। সেই শান্তি এমনভাবে পাশ করল আর নিমু ফেল্। এর পর ওঁদের আশ্রয় শান্তির পক্ষে খুব প্রীতিপ্রদ হবে না ত! তাঁর লজ্জা যা তা-ত রইলই —শান্তিকে নিয়ে আবার এক সমস্যা।

তবে, ঈশ্বর যা করেন সে নাকি মঙ্গলেরই জন্য।

হরিশবাবুর চোখ দুটি যেন জ্বলে উঠল। এইত, এ ত ঈশ্বরেরই নির্দেশ। তিনি মন স্থির করে ফেললেন এক নিমেষে।

ফলাফলের ছাপা বইখানা হাত থেকে নামিয়ে রেখে হরিশবাবু বললেন, 'তাহলে ত তোমার আর ওখানে থাকা হয় না!'

চমকে উঠল শান্তি। ভয়ে ভয়ে সে বললে, 'কেন? ওঁরা কি কিছু?'...

'না, ওঁরা হয়ত মুখে বলেননি। কিন্তু শোভনতা বলে একটা জিনিস আছে ত! তুমি পাশ করলে—ভালভাবেই করলে—আর ওঁদের ছেলে ফেল্ করল। তারওপরে তুমি ওঁদের খরচে খাবে-পরবে, থাকবে ও পড়বে সেটা ওঁরা মনে মনে হয়ত পছন্দ করবেন না। হয়ত কোনদিন আকারে-ইঙ্গিতে সে বিদ্বেষ বেরিয়ে পড়বে, আমি মানুষের মন জানি ত!'

শান্তি যেন ব্যাকুলভাবে কী বলতে গেল, হরিশবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'সে জন্য তোমার ভাবতে হবে না বাবা, আমিই যেমন ক'রে হোক্ তোমাকে পড়াব। কলেজে ফ্রি করাটা বোধ হয় খুব অসম্ভব হবে না, বাকী একটা মেসের খরচ আর হাত খরচ—কাপড়-জামা—সে যেমন করেই হোক্ জোগাবো। অবশ্য একটা টিউশ্যানী করলেও হয় কিন্তু সে আমি তোমাকে করতে দেব না, তাতে রেজাল্ট খারাপ হবার সম্ভাবনা আছে। আই-এস-সির রেজাল্টটা এর চেয়ে ভাল তোমাকে করতেই হবে!'

কিন্তু হরিশবাবু শান্তির কথাটা বুঝতেই পারেননি। শান্তি মাথাটা আরও হেঁট করে প্রায় মরীয়া হয়েই বলে উঠল, 'কিন্তু নিমু কি ছাড়বে স্যার! ও হয়ত বড় বেশি জোর-জবরদস্তি করবে।'

হরিশবাবুর কি আজ কেবল বিস্মিত হবারই পালা?...

তিনি একটু অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'নিমু না ছাড়লে আর কি করা যাবে। সে কি আর তার বাপ-মায়ের বিদ্বেষ থেকে তোমাকে দিনরাত বাঁচাতে পারবে! তাছাড়া নিমুর কাছে না থাকাই তোমার ভাল শান্তি। তা না হলে এর চেয়ে ভাল রেজাল্ট করা শক্ত হবে।'

শান্তি অন্যদিকে চেয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় বলে ফেললে, 'নিমু নিজে না ছাড়লে আমার আসা শক্ত স্যার। ওকে ব্যথা দিতে পারব না। ওকে —ওকে বড্ড ভালবেসে ফেলেছি।'......

হরিশবাবু পাথরের মত বসে রইলেন কিছুকাল। তারপর একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস দমন করে বললেন, 'পারবে না?...তাইত!'

সহসা উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে আলনা থেকে জামাটা নিয়ে বললেন, 'চলো ত যাই একবার ওঁদের বাড়ি। দেখি কি হয়।'

নিমুর বাবা বেশ প্রশান্ত মুখেই ওঁদের অভ্যর্থনা করলেন। তিনি বেশ সহজভাবেই নিয়েছেন ব্যাপারটা।

শান্তি হেঁট হয়ে প্রণাম করতে যেতেই সবলে উঠিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরলেন, 'দূর পাগল! হাজার হোক্ ব্রাহ্মণের ছেলে তুই। জাতসাপ! পায়ে হাত দিতে আছে!'

হরিশবাবু হাত দুটো কচ্‌লে বললেন, 'কিন্তু আমি যে সুখী হ'তে পারলুম না একটুও। নিমুর জন্যে নিজেকে বড় অপরাধী মনে করছি।'

'সে কি কথা! আপনি কি চেষ্টার ত্রুটি করেছেন? আপনি এতকাল পড়াচ্ছেন ওকে, আমি জানি না কী যত্ন ক'রে পড়ান! তাছাড়া—এ হতভাগাও রাত দেড়টা দুটো পর্যন্ত জেগে নিমুর পেছনে খেটেছে, আমি অনেকদিন রাত্রে উঠে জানলা দিয়ে দেখেছি। আসলে ওর মাথা নেই, আপনারা করবেন কি!'

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করে রইলেন, শান্তি ভেতরে চলে গেল গৃহিণীকে প্রণাম করতে। নিমুও বোধহয় সেখানেই আছে।

হরিশবাবু বললেন, 'আমি মনে করছি শান্তিকে এবার একটা হোস্টেলে রাখবার ব্যবস্থা করব'—

বিষম চমকে উঠলেন যেন নিমুর বাবা,…'সে কি? কেন? এখানে ওর কি কোন অসুবিধা হচ্ছে?'

'ছি ছি! কী যে বলেন। আপনারা ত এতকাল ওর ভার বইলেন, আর কি বেশি জুলুম করা উচিত?'

'ও, এই! না মাস্টার মশাই, একবার যখন ওর ভার আমাকে দিয়েছেনই—আর কেড়ে নেবেন না। ও আমার ছেলের মতই হয়ে গেছে। তা ছাড়া নিমু ওকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। শান্তিও নিমুকে বড় ভালবাসে।'

কিছুক্ষণ মৌন হয়ে রইলেন হরিশবাবু। আসল কথাটা বলা হ'ল না। বলতে সঙ্কোচে বাধল। শান্তির কল্যাণের জন্য তাকে সরাতে চান এতকাল পরে, বিশেষত নিমু ফেল্ করার পরে—একথা ওঁকে কি ক'রে বলবেন? কী কৈফিয়ৎ দেবেন?—কী কারণ দেখাবেন? না, সে সম্ভব নয়।

অবশেষে যা বলতে পারলেন তা এই, 'তাহ'লে কিন্তু একটা আর্জি আছে।'

'কি বলুন।'

'নিমু আর সুধার পড়ানোর ভার শান্তিই নিক্।'

'কেন, আপনি কি ওদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন?'

'না-না। ছি! বড় ভাল ছেলে দুটি আপনার। তা নয়—শান্তির আত্মসম্মানটা একটু বজায় থাক্। এটাও এক রকমের শিক্ষা পালবাবু। পরভৃৎ হওয়াটা ভাল নয়। একেবারে পরনির্ভরশীল হওয়া আরও খারাপ।'

'কিন্তু ওর ক্ষতি হবে না?'

'কেন ক্ষতি হবে। এমন ক'রে ত অনেকেই পড়ছে। আর এবার

ত ওর নিজের খরচ নিজেই চালানো উচিত।'

'আপনার কাছে যেন কোথায় একটা অপরাধ হয়ে যাচ্ছে।' নিমুর বাবা অস্বস্তি বোধ করেন।

'আমার এই অনুরোধ না শুনলে বরং অপরাধ হবে।' দৃঢ়কণ্ঠে বলেন হরিশবাবু।

'যা আদেশ করেন।'—অগত্যা নিমুর বাবা হতাশভাবেই বলেন। তারপর দেরাজ খুলে পুরো এক মাসের মাইনেই হরিশবাবুর হাতে গুঁজে দেন।

'কিন্তু একেবারে ত্যাগ করবেন না যেন!'

'নিশ্চয়ই না। আমি প্রায়ই আসব শান্তি ঠিক পড়াতে পারছে কিনা দেখতে। নজর রাখব বৈকি! শান্তিকে একটু ডাকুন ত, আমার সঙ্গে একটু চলুক।'

শান্তি আসতে হরিশবাবুই সংবাদটা দিলেন, 'ওঁরা তোমাকে ছাড়তে রাজী নন শান্তি। কিন্তু চিরকাল ওঁদের ঔদার্যের ওপর তুমি জুলুম করো, এটাও আমার ইচ্ছা নয়—আমি পালবাবুকে বলে দিলাম, আজ থেকে নিমু আর সুধাকে তুমিই পড়াবে।'

শান্তি হতবাক্। নিমুর বাবা একটু যেন অপ্রতিভভাবে উঠে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন,—'তোমাকে এভাবে ভারাক্রান্ত করবার ইচ্ছা ছিল না শান্তি, কিন্তু মাস্টার মশাইয়ের আদেশ!'

হরিশবাবু আর বাদানুবাদের অবকাশ না দিয়ে শান্তিকে একরকম টেনে নিয়েই বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তায় বেরিয়ে শান্তি ওঁকে প্রণাম ক'রে বললে, 'আমি ত বেঁচে গেলাম, কিন্তু আমার উপকার করতে গিয়ে আপনার এমন অনিষ্ট করলেন কেন স্যার!···আমি না হয় অন্য কোথাও কিছু একটা—'

ওর চোখ ছল্ ছল্ করতে লাগল।

ওকে একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে পথ চলতে চলতে হরিশবাবু বললেন, 'দূর পাগল! আমার আবার অনিষ্ট কি? আমি আর একটা টিউশ্যনী জুটিয়ে নিতে পারব না? বরং তখন যদি এরও ওপর আর একটা জুটিয়ে নিয়ে তোকে নিজের কাছে রাখতুম!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হরিশবাবু। ওঁর ইঙ্গিতটা হয়ত বুঝল শান্তি, হয়ত বুঝল না। সে মাথা হেঁট করেই রইল—

কলেজ স্কোয়ারে পৌঁছে হরিশবাবু একটা কলম কিনলেন বড় দোকান থেকে। চব্বিশ টাকা দাম কলমের। তারপর তিন টাকা দিয়ে রেক্সিন-বাঁধানো একটা ফাইল। তাতে কাগজ পরানো আর খোলা যায় ইচ্ছামত। আর একখানি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী। সব কেনা হ'লে ওর হাতে দিয়ে বললেন, 'তোর বাবা থাকলে তিনিই এসব দিতেন শান্তি। এ পুরস্কার তাঁরই দেওয়ার কথা। কিন্তু আজ আমারও বড় গৌরবের, বড় আনন্দের দিন!···তোর সামান্য সখও যদি মেটাতে পারি।···ঘড়িটা পারলুম না বাবা, যা দাম হয়েছে—'

'এ কী করলেন স্যার?···এই এত খরচ আপনি আমার জন্যে—' ব্যাকুলভাবে আরও কত কি বলতে যাচ্ছিল, ঝর্ ঝর্ করে জল ঝরে পড়ল ওর চোখ দিয়ে।

'ছি ছি চোখ মোছ্—চোখ মোছ্! লোকে দেখলে কি বলবে?'

হরিশবাবু অতঃপর ওকে টান্তে টান্তে নিয়ে গেলেন এক বড় খাবারের দোকানে, রাজভোগ, পান্তুয়া, অমৃতি—পাগলের মত হুকুম করতে লাগলেন।

'খা বাবা আমার সামনে পেট ভ'রে। আমি দেখি। ভাল ক'রে কোনদিন ত কিছু খাওয়াতে পারলুম না। বাড়িতে খাওয়ানোই উচিত

ছিল কিন্তু বুঝিস ত—ওখানে আয়োজন করতে গেলে সব ক-জনের জন্যেই—সে অনেক খরচ। নিমু পাশ করলেও না হয় একদিন ফিস্ট দিতাম, সব কটা ছাত্রকে।···খা বাবা, ভাল ক'রে খা। আজ তোর বাবা থাকলে এমন দিনে কত কি আনন্দ করতেন বল দেখি!'

চোখের জলে খাবারগুলো দৃষ্টি থেকে মুছে যায়,···গলার কাছে ডেলা পাকায়, তবু হরিশবাবুর আগ্রহাতিশয্যে খেতে হয় শান্তিকে।

ওখান থেকে বেরিয়ে হরিশবাবু আরও একবার ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, 'যা ত'াহলে। মাঝে মাঝে দেখা করিস।—এবার যেন নিমু পাশ করে ঠিক।'

প্রণাম করে শান্তি চলে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে বললেন, 'আর শোন্।···যদি আমার কাছে কিছু ঋণ আছে মনে করিস আর সে ঋণ শোধ করার ইচ্ছা থাকে—তাহ'লে চেষ্টা কর আই-এস-সিতে যাতে ফার্স্ট হতে পারিস। প্রথম পাঁচজনের মধ্যেও যদি হ'তে পারিস ত তোর ঋণ শোধ জানবি।'

ক্লান্ত হরিশবাবু বাসার পথ ধরলেন। পঞ্চাশ টাকার মধ্যে সামান্য ক'টা টাকাই আছে। গৃহিণীকে হিসাব বুঝ্ দিতে গিয়ে বিস্তর মিথ্যা বলতে হবে—তারই মুসাবিদা করতে করতে চললেন মনে মনে।

কাজলের বিয়ে

ফ্রক পরা যে তাকে কোনমতে মানায় না, পরমেশ্বর বাবুও তা জানেন, কিন্তু শাড়ি ত সুদ্ধমাত্র শাড়ি নয়, তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক আরও যে নানা রকমের পোষাক বিংশ শতাব্দীর উৎপাত হিসেবে এসে জুটেছে, তাদের কথা স্মরণ ক'রে জোর ক'রেই সেদিকে চোখ বুজে থাকেন। আর সেই জন্যই গত বছর-চারেক যাবৎ বয়সটা ওর এগারো বছরে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন—নইলে ফ্রক-পরানোর কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় না। পরমেশ্বরবাবু কাজ করেন এক দোকানে, পাড়ায় তাকে মার্চেণ্ট অফিস বলে চালালেও সেটা দোকান ছাড়া আর কিছু নয়। ঠিক সাতটায় বাড়ি থেকে বেরোতে হয়, ফেরেন রাত ন'টায়। দুপুরে দু' ঘণ্টা খেতে আসার ছুটি। মাইনে এই দীর্ঘ দিনে মাগ্‌গী ভাতা নিয়েও সাতষট্টি টাকার ওপরে ওঠেনি। তার ওপর ঘরে চিররুগ্না স্ত্রী। তবু ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন যে, বেশি ছেলেপুলে হয়নি। মেয়ে এই কাজল, আর একটি বছর চারেকের ছেলে খোকা। ব্যাস্‌। কিন্তু তাতেই যদি খরচটা খতিয়ে দেখেন আপনারা—সপ্তাহে সপ্তাহে রেশন, বাজার, কাপড়, ধোপা, নাপিত, গয়লা, কয়লা, ঘুঁটে, তেল দু'রকমের—রান্না ও জ্বালানী, মশলা, ডাল মায় মান্থলী টিকিট পর্যন্ত ত, আপনারাই হাঁপিয়ে উঠবেন। ছোট দোকান, মালিক দিনরাত আগলে বসে থাকেন, চুরির সুযোগ-সুবিধা নেই বললেই চলে। দৈবাৎ কোন-দিন এটা ওটা—সিকিটা আধুলিটা—তাতে কি হয় বলুন? সংসার চলে?

সুতরাং ফ্রক প'রে খুকী সাজলেও কাজলকেই সেই অনুপাতে সংসারে খাটতে হয়। ও নিজেই বলে, 'বাবা ত খালি মাসকাবারে ক'টা টাকা এনেই খালাস! সংসারটা করে কে? সে ত চার জনের ভার এই আমারই মাথায়!'

বাস্তবিক, ভোর থেকে রাত পর্যন্ত ওর খাটুনি একেবারে রুটিনবাঁধা —নিরন্ধ্র। ছ'টায় বাবার চা চাই, ওরই মধ্যে মুখ ধোবার জল সংগ্রহ করে আনা, মায়ের মুখ-হাত ধোয়ানো, বাসি পাট সারা, বাবার স্নান সারা হ'লে ছোলা গুড় দেওয়া—এ সব সেরে আবার সেই মোড়ের কলতলায় গিয়ে ধন্না দেওয়া, রান্না-খাওয়ার জলের জন্য। পাড়ায় প্রায় চল্লিশটা বাড়ির অন্ততঃ সত্তরটি গৃহস্থের জন্য এই একটি কল। সাতটা নাগাৎ অর্থাৎ কাজলের যখন জল নেবার সময় হয়, তখন প্রায় পঁচিশ ত্রিশটা ঘড়া বাল্‌তি এসে জমে। তবে কাজল সে সব গ্রাহ্য করে না, সে যখন পৌঁছয় তখন যার পাত্র কলের তলায় থাকে তার নেওয়া শেষ হ'লেই ও ছোঁ মেরে যেন কলটা কেড়ে নেয়; সবাইকে ডিঙিয়ে মাড়িয়ে ঠেলে নিজের বাল্‌তি এগিয়ে দেবেই। প্রতিবাদ করলেই সরু অথচ চড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠবে, 'তা কি করব, আমাদেরও ত খেতে হবে, না কি আপনারা ছিষ্টির জল নেবেন আর আমরা এক বাল্‌তি খাবার জল পাবো না? এ আবার কি বিচার?...কোম্পানী কি শুধু আপনাদের জন্যেই কল করে দিয়েছে না কি?'

ভারীদের ত তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়, 'যাও, যাও! তোমরা করবে ব্যবসা, মোটা মোটা টাকা রোজগার ক'রে দেশে পাঠাবে, তার জন্য আমরা একটু খাবার জল পাবো না? বা রে, মজা ত মন্দ নয়! যাও না, যেখানে কোন টিউব-ওয়েল কি খালি কল আছে সেখানে যাও।'

এসব ক্ষেত্রে মারামারি হয়ে যাবারই কথা কিন্তু অত বড় মেয়ের

গায়ে হাত দিতে কোন পুরুষেরই ভরসা হয় না। সেটা কাজলও জানে, জানে-যা কিছু বলুক না, শুধু মুখেই আস্ফালন ; কথায় ত আর গায়ে ফোস্‌কা পড়ে না। ঝি যারা আসে কলে জল নিতে, তাদেরই এক্ষেত্রে অসুবিধা বেশি, কারণ তাদের সময় কম—তাদের কেউ কেউ ওকে দমন করবার চেষ্টাও করেছিল, এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। তারা কেউ কিছু বললে, ও একেবারে থিয়েটারের ভঙ্গীতে বলে ওঠে, 'চোপ রও, ঝি ঝিয়ের মত থাকো। না হয় তোমাদের সঙ্গে জল নিতে এসেছি রাস্তার কলে, আমি বামুনের মেয়ে তা জানো। একটা কথা কইবে না, আমার এই দু' বাল্‌তি তোলা হোক, তবে কল ছাড়ব, তার আগে নয়!'

এক বৃদ্ধা মহিলার একবার দুর্মতি হয়েছিল, তিনি জোর করে ওর হাতসুদ্ধ বাল্‌তি সরিয়ে দিতে গিয়েছিলেন, ফলে কাজল এমনই হাত মুচড়ে দিয়েছিল তাঁর যে, হাতের ব্যথায় তিন দিন তিনি কোন কাজ করতে পারেন নি। তাঁর ছেলে শাসন করতে এসেছিলেন, কিন্তু ওর মুখের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না,—'উঃ! উনি আবার এসেছেন ঐ বুড়ি ডাইনীর হয়ে ঝগড়া করতে! কী করবেন কি? ফাঁসী দেবেন না শূলে দেবেন? যা করবার করুন গে, পুলিশে খবর দিন গে। বুড়ি আসে কেন আমার সঙ্গে লাগতে।—ও বুড়ি, কলা-খাবি?' এই বলে ভেংচি কেটে বেঁকে চুরে হাত-পায়ের একটি বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে কাজল চলে গেল, সতীনাথবাবু একটা কথাও আর কইবার অবকাশ পেলেন না, সত্যিই কিছু আর এই তুচ্ছ কারণে থানা-পুলিশ করা যায় না—অত বড় মেয়েকে মারাও সম্ভব নয়। কীই বা করবার আছে?

জলতোলার পর্বটা অবশ্য বেশীক্ষণ নয়। কারণ স্নান চলে পুকুরে, খায়া মোছা ও মায়ের স্নানের জলও সেখান থেকেই তুলে দেয় সে। পুকুর ত ভারি, ডোবা বললেই হয়—চৈত্র মাস না পড়তে পড়তে পোকা থিক্‌থিক্ করে। তবু উপায় নেই বলেই পাড়াসুদ্ধ এই পুকুরে স্নান করে।

সাড়ে সাতটার সময় কাজল বাজারে যায়। সেখানেও এক পর্ব, আনাজ-ওয়ালাদের সঙ্গে ঝগড়া, জেলের সঙ্গে বিবাদ কচকচি—এ ওর নিত্য নিয়মিত। 'ও কি, ও কি ওজন হচ্ছে, দেখি দেখি—এ যে একেবারে সোনার ওজন হ'ল। ঐরকম কি ঢ্যাঁড়শের ওজন নিতে হবে না কি? তোমার পাল্লায় একটুও পাষাণ নেই বলতে চাও?...আচ্ছা দেখি পাষাণটা একবার। ঐ ত! তবে? তবে যে বড় অমন সই সই ওজন দিচ্ছিলে?' জেলেদের কাছে গিয়ে ওজন ক'রে মাছ নেবার পর যতটা সম্ভব ফাউ চেয়ে নেবে তার পর নেবে কেড়ে-বিগ্‌ড়ে। বেশ বলিষ্ঠ জোয়ান পুরুষটার আঙ্গুল মুচড়ে মাছ বার ক'রে আনতে দেখেছি আমি স্বচ্ছন্দে। এখন ত জেলেরা ওকে রীতিমত ভয়ই করে। দেখলেই বলে, 'তুমি অপর জায়গায় যাও গে ঠাকরুণ, আমি তোমায় মাছ বেচতে পারবনি।'

অবশ্য তাতেও নিস্তার নেই। কাজল ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—'কেন বেচতে পারবে না? পাব্‌লিক বাজারে বসেছ, দাম দিলেই তোমার জিনিস বেচতে হবে, মাগ্‌না নিচ্ছি না কি?'

'মাগনা ত নেবে না জানি'—সে হয়ত বলে ফেলল, 'কিন্তু তোমার ও একছটাক মাছে আধ-পো ফাউ দেবে কে শুনি।'

'আর তোমরা এক ছটাক মাছে কতটা ওজনে মারো—তার বেলা কি হয়? পাল্লায় পাষাণ, বাটখারা ছোট, দেবার সময় ঝুঁকিয়ে দেখাবে

আবার জল ঢেলে ঢেলে ওজন বাড়াবে! মাছ যায় কতটা আসলে?'

খর খর ক'রে ওঠে কাজল। অগত্যা মাছ মাপতে হয় জেলেকে। তবে কাজল কখনও মেছুনীর কাছে মাছ নেয় না। পুরুষের সহজাত সঙ্কোচের পুরো সুযোগ নিতে জানে সে।

বাজার থেকে ফিরে রান্না, মাকে ভাইকে স্নান করানো, খাওয়ানো। বাবা আসেন ঠিক বারোটায়, তাঁকে গামছা-কাপড় গুছিয়ে দেওয়া। একেবারে তিনি আবার অফিসে বেরিয়ে গেলে তার অবসর মেলে। কিন্তু সে অবসর কাজল নেয় না কখনও, বিশ্রামের যেন ওর কোন প্রয়োজনই নেই। দুপুরবেলা চলে ওর আনন্দ-বিহার। কার গাছে কাঁচা আম ধরেছে কিংবা টোপাকুল, কার পাঁচিলের ধারের কলার কাঁদিতে একটি কলায় রং ধরেছে, কার সজ্‌না ডাঁটা হয়ে উঠেছে পুষ্ট—এ সব খবর ওর নখ-দর্পণে। দুপুর বেলা বাড়ির মেয়েদের চোখে যখন তন্দ্রা নেমে আসে ভারি হয়ে, তখন ও নিঃশব্দে ঘোরে পাঁচিলে পাঁচিলে, কিংবা বেড়াদেওয়া বাগান হলে বেড়া টপ্‌কে নামে। অবশ্য কলকাতার উপকণ্ঠে আজকাল আর বড় বাগান থাকা সম্ভব নয়, বাড়ির উঠানে দুটো একটা গাছ—তাই বিরল হ'তে বসেছে। তবু যা আছে তা কাজলের নাগালের বাইরে নয় কোথাও।

পাড়ার সবাই জানে এ কথা। মেয়েরা বলে 'চুরনী'—ছেলেরা গালাগালি দেয়। ছুটির দিন হলে একটু মুস্কিল হয় কাজলের, সে দিনগুলোতে শান্ত হয়ে ব'সে কাপড় বা ওয়াড় সেলাই করা ছাড়া উপায় থাকে না; কারণ, বড় ছেলেদের সে একটু ভয় করে। ছোট ছেলেদের ত গ্রাহ্যই করে না। ওর চুরিতে বাধা দিতে এলে কাউকে কান মলে দেয়, কাউকে দেয় চড়। তারা চেঁচিয়ে বড়দের ডাকবার উপক্রম করলে এমন জোরে গাল টিপে ধরে যে যন্ত্রণায় সে নীল হয়ে যায়।

পরমেশ্বরবাবুর কাছেও নালিশ গেছে ব কি। বৈহু বার। কিন্তু তিনি নিতান্তই নিরীহ লোক, হাত জোড় ক'রে নিজেই ক্ষমা প্রার্থনা করেন, 'কী করব বলুন দেখি, হারামজাদীকে কিছুতে পেরে উঠি না। কি মারধোর করি আপনারা ত দেখেছেন? ওসব গায়েই মাখে না। যাবে কোন্ দিন পুলিশের হাতে চুরি-ডাকাতি ক'রে তা আমি জানি। ...এত গাছের ডালে ডালে ঘোরে, পড়ে গিয়ে ত হাত-পাও ভাঙ্গে না —যে ছ'মাস বিছানায় শুয়ে থাকে, আমি একটু নিশ্চিন্ত হই। ওর গুণ শুন্‌তে শুন্‌তে যে আর পারি না।'

পাড়ার লোকও তা বোঝে। তাই তাঁকে আর বিশেষ কিছু বলে না। মেয়েরা শুধু গাল পেড়ে নিষ্ফল ক্রোধ শান্ত করার চেষ্টা করেন, 'হারামজাদী মেয়ে! হারামজাদীর জন্যে গাছের একটা ফল থাকবার জো নেই, ঠাকুরদের একটা ফুল দিতে পাইনে পূজোর! মুখে আগুন, যমের অরুচি হয়ে বসে আছে! মরেও ত না। এত লোকের ওলাউঠো হয়'—ইত্যাদি ইত্যাদি!

কিন্তু সে-সব অভিশাপ অগ্রাহ্য করে কাজল নির্বিকার ভাবেই ত্নপুর বেলা গাছে গাছে পাঁচিলে পাঁচিলে ঘোরে, একদিনও তার ব্যতিক্রম হয় না।

তবে একেবারে সম্প্রতি, পাড়ায় ওর ত্ন'টি ভক্তও এসেছে। মিত্তিরদের বাড়ির বৈঠকখানায় ভাড়াটে এসেছেন নকুলবাবু। কোন সওদাগরী অফিসে ভাল চাকরী করেন, বিবাহাদি করেননি, এতকাল ভাইয়ের সংসার প্রতিপালন করছিলেন। ভাইপোরা বড় হয়ে বিয়ে-থা করেছে, ভাইপো-বউরা এখন কেউ খুড়-শ্বশুরের আধিপত্য মানতে রাজী নয়, কেননা কৃতজ্ঞতার কারণটা তাদের চোখের সাম্‌নে ঘটেনি। অগত্যা

নকুলবাবু বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে সেখান থেকে চলে এসে এখানে এই ঘর ভাড়া করেছেন। চাকরের কাজ থেকে শুরু ক'রে রান্নাবান্না নিজেকেই করতে হয়। অনভ্যস্ত হাতে কষ্ট হয় খুবই—কিন্তু কী করবেন, বহু চেষ্টা ক'রেও একটা চাকর পাচ্ছেন না।

নকুলবাবুর সঙ্গে কাজলের ভাবটা কি ক'রে হ'ল তা তাঁরও জানা নেই বোধহয়। একদা দেখা গেল বাজার যাবার পথে তাঁরা দু'জনে একসঙ্গেই যান, অর্থাৎ কাজলই তাঁকে ডেকে নিয়ে যায় ; পথে স্টেশনে চা খাওয়ান ওকে নকুলবাবু এবং জিলিপীর দোকান থেকে জিলিপী। এর প্রতিদানে কাজলও কিছু করে বৈ কি ! নিজের সহস্র কাজের অবসরে এসে কুট্নো কুটে দিয়ে যায়—। প্রয়োজন হ'লে হয়ত নিজেই ওঁর ডালটা সাঁত্‌লে দিয়ে গেল। যেদিন নকুলবাবুর রান্নায় দেরী হয়ে যায়, সেদিন নিজের রান্না তরকারীও সে ফ্রকের আঁচলে ঢাকা দিয়ে নিয়ে আসে বাটি ক'রে। অবশ্য তেম্‌নি নকুলবাবুরও ভাল মাছ কিম্বা মাংস রান্নার ভাগ পায় কাজল। এম্‌নি ক'রে এই দু'টি অসম-বয়সী লোকের বন্ধুত্ব জমে ওঠে।

কাজলের আর একটি ভক্ত হ'ল অপরেশ। কুমিল্লায় বাড়ি—বাল্‌ব্‌-ফ্যাক্টরীতে নতুন চাকরী পেয়েছে। সেও স্থানাভাবে একটা ছোট ঘর ভাড়া ক'রে আছে এখানে, খায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের একটা মেসে। অপরেশের সঙ্গে আলাপ হ'ল ওর প্রথমটা বৈরিভাবেই, কলের জল আনতে গিয়ে। ওকে ঐ গুণ্ডার মত কল দখল করতে দেখে অপরেশ প্রতিবাদ করে। কাজল প্রথমটা গ্রাহ্যই করেনি, তারপর বলেছিল, 'থাম্‌ বাঙ্গাল। বাঙ্গাল এসেছে মেজাজ দেখাতে !'

অপরেশ কিন্তু অন্য লোকের মত সঙ্কোচ করেনি। সে এর উত্তরে একেবারে বাল্‌তিটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

কাজল ওর এই দুঃসাহসে কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কী যে করবে, কী যে করা উচিত যেন ভেবেই পেলে না। কারণ, চিরকাল সে-ই যা খুসী তাই ক'রে এসেছে, তার ওপর যে কেউ থাকতে পারে এ ওর স্বপ্নেরও অতীত।

কিন্তু ওর যখন সম্বিৎ ফিরে এল, অপরেশ তখন নির্বিকার ভাবে পিছন ফিরে জল নিচ্ছে নিজের বাল্‌তিতে। কাজল একেবারে পাগলের মত লাফিয়ে পড়ল, কিল চড় মেরে আঁচ্‌ড়ে কাম্‌ড়ে খিম্‌চে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ক'রে তুলল। অপরেশ কিন্তু নির্বিকার, বরং সবাই যখন হৈ হৈ ক'রে ছুটে এল, তখন সে-ই নিষেধ করলে, 'যেতে দিন না, ওর যা দৌড় ক'রে নিক্। আপনিই ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'

সত্যিই কাজল ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল। অপরেশ যখন জল তোলা হ'লে ধীরে সুস্থে বাল্‌তি হাতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, কী খুকী বাল্‌তিটা তুমিই কুড়িয়ে নেবে না আমি তুলে দিয়ে যাব?' তখন রাগে দুঃখে ওর চোখে জল এসে গেল—কিন্তু প্রতিবাদে একটা গালাগালও আর দিতে পারলে না!

এরপর বন্ধুত্বটা ওদের জমে উঠল কিন্তু দ্রুত। দু'চার দিন পরেই দেখা গেল অপরেশ নিজের সামান্য সঙ্গতি মত লজেন্সস্ টফি প্রভৃতি এনে দিচ্ছে এবং তার বদলে কাজল দিচ্ছে অপরের গাছ থেকে নির্বিকার-চিত্তে চুরি করা লিচু, গোলাপজাম, জামরুল প্রভৃতি। এমনি মাস কয়েক কাটবার পর অপরেশ ওকে একদিন সিনেমায়ও নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু কাজল শেষ অবধি রাজী হয়নি। প্রথম দিন লোভে ওর চোখ দুটি জ্বলে উঠলেও পরের দিন ম্লান মুখে এসে বললে, 'মা

যেতে দিতে চায় না যে! গালাগাল দিচ্ছে!'

অপরেশ সে গালাগালের গূঢ়ার্থটা বুঝতে পেরে দু-একবার 'থাক্‌গে' 'থাক্‌গে' বলে সক্ষোভে চুপ ক'রে গেল।

নকুলবাবু আগে, অপরেশ তার পরে। সুতরাং কাজলের বন্ধুত্বের পরিধির মধ্যে অপরেশের এই অনধিকার-প্রবেশে কে জানে কেন নকুলবাবু বড় বিরক্ত হয়ে উঠলেন। এতদিন তিনি ওর সঙ্গে আলাপ ক'রেই খুশি ছিলেন, এইবার একদিন যেচেই পরমেশ্বরবাবুর সঙ্গে আলাপ করলেন। এ-কথা সে-কথার পর আসবার সময়ে সতর্ক করে দিলেন, 'মেয়ের আপনার এখন বয়স হচ্ছে পরমেশ্বরবাবু, এইবার একটু কড়া নজর রাখুন! এখন আর যেখানে সেখানে ঘুরতে কিংবা যার তার সঙ্গে মিশতে দেবেন না।'

'বটেই ত! বটেই ত!' পরমেশ্বরবাবু সায় দেন, 'এত ক'রে বারণ করি ছুঁড়িকে—। কোথায় গেল সে হারামজাদী—'

সে হারামজাদীকে তখনই ডেকে শাসন করার প্রস্তাবে নকুলবাবু কিন্তু সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন,…'ঐ ছেলেটি কে পরমেশ্বরবাবু, ঐ যে সত্যদের চালাঘরটাতে ভাড়া আছে?'

'ও—কে, অপরেশ? হ্যাঁ, হ্যাঁ—বাল্‌ব-ফ্যাক্টরী না কোথায় যেন কাজ করে। পূর্ববঙ্গে বাড়ি।'

'অপরেশ বুঝি, তা হবে। আমি ভেবেছিলুম বুঝি আপনাদের কোন আত্মীয়!…ওর কাছে আজকাল কাজলের যাতায়াত বড্ড যেন বেড়েছে!'

'আত্মীয় নয়, তবে স্বজাতি বটে। তা ওখানে অত যাওয়া-আসাই বা কেন তার! দাঁড়ান না, দেখাচ্ছি মজা সে হারামজাদীকে—'

নকুলবাবু আর দাঁড়ান না কিন্তু মোটেই। বরং দ্রুত প্রস্থান করেন।

অবশ্য এতে ফল হয় উল্‌টো। কাজল অপরেশের সঙ্গে আলাপ বন্ধ করে না, নকুলবাবুর বাড়ি যাওয়াই বন্ধ করে। অনেক ক'রে সেধে রাগ ভাঙ্গিয়ে নকুলবাবু আবার বন্ধুত্বটা ঝালান।

পূজোর আগে অপরেশ দেশে যায়, যাবার আগে কাজলকে দিয়ে যায় নানা উপহার—তেল, সাবান, এসেন্স, খুচরো প্রসাধনসামগ্রী। কাজলের কাছে তা স্বপ্ন। আশাতীত, কল্পনাতীত সৌভাগ্য।

সে উজ্জ্বল মুখে নকুলবাবুকে এনে দেখায় সেগুলো। নকুলবাবু সব দেখে শুনে বলেন, 'মন্দ নয় এসেন্সটা—তবে এ তেলটা বড্ড খেলো, মেখো না—চুল উঠে যাবে।'

কাজলের মুখ ম্লান হয়ে আসে। সে বলে, 'খেলো? তবে যে অপরেশদা বললেন অনেক দাম!'

'ওর কাছে অনেক বৈ কি! বেচারীর কীই বা আয়! যা দিয়েছে বেশ দিয়েছে।'

দিন-চারেক পরে নকুলবাবু ওকে এনে দেন এক জর্জেটের ঝক্‌ঝকে শাড়ি। কাজল ত স্তম্ভিত, পরমেশ্বরবাবুরও মুখ শুকিয়ে ওঠে সে জিনিস দেখে!

'এ সব করেছেন কি নকুলবাবু—এ যে একগাদা টাকা দাম! এমন ভাবে টাকা নষ্ট করা ঠিক হয়নি। বাস্তবিক—পরের জন্য—'

'চিরদিনই ত পরের জন্য টাকা খরচ ক'রে গেলুম পরমেশ্বরবাবু। রোজগার ত কম করিনি—সব ঢাললুম ঐ বেইমান বেটাবেটিদের পায়ে, কী ফল হ'ল? তার চেয়ে ঢের আপন আমার কাজল!'

এই বলে একটু থেমে নকুলবাবু আবার বললেন, 'সেদিন আমার অফিসের এক ফ্রেণ্ড তাই বলছিল। বলছিল,—নকুল, যতই বল্‌, নিজের

একটা সংসার দরকার। পরের জন্যে যতই করিস না কেন—পর পরই থেকে যায়। নিজের ইউনিট্ একটা না থাকলে কি চলে?…সে বলে কিনা, এখনও সময় আছে নকুল, একটা বিয়ে কর্।'

'ঠিকই ত বলেছেন তিনি'—পরমেশ্বরবাবু বলেন, 'এখনও ঢের সময় আছে।'

'হ্যাঁ'—যেন কতকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বলেন নকুলবাবু, 'এই বয়সে আবার বিয়ে।…কী যে বলেন! আপনিও কি ক্ষেপে গেছেন নাকি?'

'কেন, কত বয়স আপনার?'

'বয়স? তা ধরুন এই সাত—চল্লিশ বিয়াল্লিশ হ'ল বৈ কি!'

একটু যেন খতিয়ে নিয়ে বলেন নকুলবাবু।

'তা এ আর এমন কি বয়স, এ বয়সে ত হামেশাই বিয়ে হচ্ছে।'

'আপনিও যেমন! মেয়ে কে দেবে আমাকে।…কী আছে আমার?'

'কেন দেবে না? অমন মোটা মাইনের চাকরী করেন।'

'তা অবশ্য করি। ভাতা-টাতা নিয়ে মাস গেলে সাড়ে তিনশ' টাকা ঘরে আসে।'

'সা-ড়ে-তিন-শ?' মুখ প্রায় বিবর্ণ হয়ে ওঠে পরমেশ্বরের।

'হ্যাঁ, সাড়ে তিনশ ত বটেই। কোন কোন মাসে আরও বেশি। তাও দেখুন না—এতগুলো টাকা রোজগার করি, তবু সময়ে ভাত-জল দেয় এমন একটা লোক নেই। নিজেকে হাত পুড়িয়ে—'

একটা করুণ ঔদাসীন্য ফুটে ওঠে নকুলবাবুর মুখে। বাক্য অসমাপ্ত রেখেই থেমে যান তিনি।

পূজোর পর অপরেশ বাড়ি থেকে এসে লোকপরম্পরায় কথাটা শুনলে। নকুলবাবু নাকি কথাটা অপরকে দিয়ে পাড়িয়েছিলেন। কাজলের বাবা-মা দু'জনেই রাজী হয়েছেন। কাজলের মাকে ইলেক্‌ট্রীক চিকিৎসা করিয়ে সারিয়ে দেবেন নকুলবাবু, পরমেশ্বরের দেনা শোধ করে দেবেন এবং বিয়ের যাবতীয় খরচা সব তাঁর!

শুনে স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে অপরেশ। ও যেদিন আসে সেই দিনই একবার কাজল এসেছিল। তার পর আর আসেনি। কিন্তু তখনই ওর মুখের একটা থমথমে ভাব লক্ষ্য করেছিল অপরেশ, কেমন যেন গম্ভীর, একটু হয়ত বিষণ্ণও। আর একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে—সে এখন শাড়িই প'রে।

পরের দিন অফিসে গেল না অপরেশ। দুপুরবেলা পাড়ার একটা ছোট ছেলেকে দিয়ে ডেকে পাঠাল কাজলকে। কথাটা পাড়লে সোজাসুজি, আসার সঙ্গে-সঙ্গেই।

'কাজল,...তোমার বাবা নাকি ঐ বুড়োর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিচ্ছেন।'

'নকুলবাবু বুড়ো নন্। ওঁর এই মোটে চল্লিশ বছর বয়স।' একটু বিরক্তভাবে, একটু দৃঢ়তার সঙ্গেই কথাগুলো বলে কাজল। কিন্তু অপরেশের দিকে মোটে তাকায় না।

'হ্যাঁ চল্লিশ! চল্লিশ ওর হাঁটুর বয়স।...এ বিয়ে কিছুতেই হতে পারবে না কাজল, আমি বলে দিলুম।'

'কি করবেন?'...অদ্ভুত একরকম ভাবে তাকায় কাজল।

'কি করব ?' একটু থম্‌কে থেমে উত্তর দেয় অপরেশ,...'আমিই তোমাকে বিয়ে করব।'

মনে হ'ল যেন চকিতে কাজলের মুখটা রাঙ্গা হয়ে উঠল, যেন এক ঝলক খুশি উপ্‌চে উঠল ওর দৃষ্টিতে। একবার মাত্র অপরেশের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে মুখ নিচু করলে সে !

অপরেশ তখন রীতিমত তেতে উঠেছে। সে অধীর হয়ে বললে, 'আমি আজই তোমার বাবার কাছে কথাটা পাড়ব। আমি তোমার স্বজাতি। আপত্তির কী আছে ?'

কাজল একটু ইতস্ততঃ করল, একবার যেন কেমন অসহায়ভাবে চাইল ওর দিকে, তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি কত মাইনে পাও অপরেশদা ?'

'কেন ? ওর মত বিশ ভরি সোনা দিতে পারব কি না ?—না, তা পারব না।'

'বলই না।'

'তা প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, মাগ্‌গী ভাতা-টাতা নিয়ে।'

এই বলেই দ্রুত বলে উঠল, 'আরও বাড়বে সামনের মাস থেকে।'

'তা থেকে দেশে পাঠাও কত ?'

'বেশি না। কোন মাসে দশ, কোন মাসে পনেরো।'

কাজল এবার মুখ তুলে চাইল।

'তুমি বাবাকে কিছু ব'ল না অপরেশদা। তিনি যা করছেন তাই ভাল !'

সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আড়ষ্ট অপরেশের কণ্ঠ থেকে একটা বিস্ময়ের ধ্বনিও বেরোল না। সে অপলক নেত্রে ওর গতিপথের দিকে চেয়ে বসে রইল।

উদয়াস্ত

রাত চারটের সময়ই রোজ ঘুম ভেঙ্গে যায় দেবেনবাবুর—আর কিছুতেই শুয়ে থাকতে পারেন না। বোধহয় আগের রাত্রে গৃহিণী, কন্যা ও পুত্রবধূ সংসারের কোন্ কোন্ জিনিস কী কী বিশৃঙ্খল অবস্থায় ফেলে রেখে শুতে গেছেন সেই দুশ্চিন্তাই তাঁকে তাড়না ক'রে উঠিয়ে দেয়। তিনি সন্তর্পণে স্ত্রীর ঘুম না ভাঙ্গিয়ে খাট থেকে নেমে পড়েন এবং তেম্নি নিঃশব্দে ঘরের দোর খুলে বেরিয়ে আসেন।

আর প্রতিদিনই তাঁর জন্য বহু অকাজ অপেক্ষা ক'রে থাকে।

বড়ছেলে রাত দশটার সময় ক্লাব থেকে ফিরে চা খায় এক কাপ, তারপর স্নানাদি সেরে ওপরে ওঠে—সেইখানেই খাবার ঢাকা থাকে তার। সে থাক্—কিন্তু সেই চায়ের কাপটিও হয়ত সিঁড়ির নিচের ধাপের মাঝখানে বসানো আছে, ছেলেপুলে কেউ উঠে পড়লেই পা লেগে চলে যাবে উঠোনের মাঝখানে। সেটা সরাতে হবে। দালানে বসে কাল শেষবার বৌমা দুধ খাইয়েছিলেন মেয়েকে—ফিডিং বোতল তেমনি পড়ে আছে, একটু গরম জল ক'রে সেটা ধুতে হবে। কাপড় জামা রাত্রে যা ভিজে ছিল তা তুলে এককোণে জড়ো ক'রে রেখে দিয়েছে মেয়ে—সেগুলো ভেতরেই মেলে দেওয়া যেত কিন্তু অত কাজ করে কে? সুতরাং সেগুলো মেলে দিতে হবে। ঘুঁটের ঝুড়িটা শেষ রাতের বর্ষায় ভিজে গেছে, ভেতর থেকে শুক্‌নো ঘুঁটে সংগ্রহ ক'রে আজকের উনুনে আঁচ দেবার মত রেখে বাকীগুলো বাইরে মেলে দিতে হবে। তারপর ঝি আসতে দেরি হ'লে উনুনে আঁচ দিতে হবে। বৌমার

জন্যে জল তুলে বাথরুমে রেখে দেওয়া দরকার। ঠিকে ঝি এত করে না—ছেলেরা ত' কেউ সাতটার আগে উঠবেই না। বৌমারও শরীর খারাপ। কয়লাগুলো ঠিক করা হয়নি তিন চার দিন হয়ত—খুব কুঁচোগুলোকে গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে কয়েকটি গুল দিয়ে দিলে ভাল হয়। গৃহিণী দেন অবশ্য, কিন্তু তাঁর দিতে দিতে হয়ত বেলা একটা, ভোরে দিলে সকালবেলার রোদটা পায়। মাঝারি কয়লা আর বড় কয়লাতে মিশিয়ে না রাখলে ঝি হাতের কাছে যা বড় কয়লা পাবে তাইতেই আঁচ দেবে, এরপর শুধু ছোট কয়লা দিলে ভাল আগুন হবে না—মেয়েরা বকাবকি করবে। হয়ত নতুন কয়লা আনিয়েই নেবে।

তারপর বাজার যাওয়া। ইতিমধ্যে বাড়ির লোক উঠে পড়লে কার কী প্রয়োজন জেনে যাওয়া যায়—নইলে দোকর যেতে হয়। দোকান আছে, তেল আনা, রেশন আনা, গম ভাঙ্গানো—এসব ত উল্লেখ বাহুল্য। তারপর ছেলেমেযেদের ফাইফরমাস আছে। বড়ছেলের ট্রাউজার ইস্ত্রি করতে হবে, মেজ ছেলের সার্টে বোতাম নেই, সেজ-ছেলের জামায় খোঁচা লেগেছে—রিপু করতে হবে, ছোট ছেলের ইস্কুলে বই নিয়ে যাওয়ার থলে চাই, বড় মেয়ের জামা এবং সেজছেলের গেঞ্জি সাবান দিতে হবে—ছোট মেয়ের বইয়ে মলাট না দিলে চলবে না—এ সব, এমনি আরও হাজার কাজের মধ্যে সামান্য কয়েকটা মাত্র।

ফলে অফিস যাওয়ার সময় তাড়াহুড়ো ক'রে স্নান খাওয়া—এ তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক। এক একদিন মেজ বা সেজ ছেলের কলেজের সময় হ'লে দুজনে দুদিকে স্নান করতে নামলে তাঁর স্নানও হয় না। কোনমতে দুটো হাতে-মুখে গুঁজে সরে পড়া—। অফিসেই যা একটু বিশ্রাম। এক বড় হার্ডওয়ার মার্চেণ্টের ফার্মে কাজ করেন তিনি। সেখান থেকে বেরিয়ে নিজে কিছু কিছু ব্যবসা করেন। পাইকিরি অর্ডার সাপ্লাই—

সে প্রায় রাত আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত অর্থাৎ যতক্ষণ না লোহাপটির দোকান বন্ধ হয়—ততক্ষণ ঘুরে বেড়ান। তারপর ফেরবার মুখে বড়-বাজার থেকে সস্তায় বাজার যা পান সংগ্রহ করেন। ঘোরাঘুরির ফাঁকে-ফাঁকেই ছেলেমেয়েদের জন্যে হরেকরকম বাজার হয়ে গেছে—বিস্কুট, চা, পান, লজেন্স, জামার ছিট, খাতার কাগজ, শাড়ি গামছা আরও কত কি! এ ছাড়া আছে ডাল, মশলা, পাঁপর—এগুলো বড়বাজারে সস্তা শুধু নয়, জিনিসও বাছাই করা।

বাড়ি ফেরেন লাস্ট ট্রেনে—অর্থাৎ দশটায়। তখন এসে দেখেন গৃহিণী শুয়ে পড়েছেন, বৌমাও ছেলেমেয়ে নিয়ে মশারীর মধ্যে। বড়-মেয়ে শুধু স্পিরিট ল্যাম্পে এক কাপ চা ক'রে দেয় ওঁকে—মুখহাত ধুয়ে চা-পান শেষ ক'রে তিনি আবার লেগে যান সংসারের কাজে—ডাল মশলা ঝেড়ে বেছে ভাঁড়ারে তোলা, আনাজ-পত্রগুলো ধুয়ে ডালায় রেখে ডালাটা বাথরুমের টিনের চালে হিম লাগবার জন্য তুলে দেওয়া—এসব সেরে, কার বইয়ের মলাট দিতে হবে, কার খাতা সেলাই করতে হবে কিংবা বালিসের ওয়াড় বা ব্লাউজ সেলাই—এই কাজে লেগে যান।···বড় ছেলে ও মেজ ছেলে রাত সাড়ে দশটা এগারটায় ওপরে উঠলে তখন বৌমা খাবার দিতে নামেন খাট থেকে—তাও তাঁকে একটু সাহায্য না করলে চলে না। তবু সেই সময়টাই যা অবসর, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে করতে খাওয়া—এইটুকুই যেন স্বর্গসুখ মনে হয় ওঁর কাছে।

তবে দেবেনবাবু এ জীবনযাত্রায় একটুও বিরক্ত নন্—বোধ হয় ক্লান্তও নন। তাঁরই সংসার—ছেলেমেয়ে-স্ত্রী-নাতিনাতনী—সবই তাঁর। এদের জন্যে খাটার মধ্যে অনির্বচনীয় একটা তৃপ্তি আছে—এ যে নিজে

না বোঝে তাকে দেবেনবাবু বোঝাতে পারবেন না। পরলোকের চিন্তা তাঁর এই ছাপান্ন বছর বয়সেও নেই। স্ত্রী দীক্ষা নিয়েছেন কিন্তু তিনি নেননি। 'ওসব দমবাজীতে আমি নেই'—এই উত্তর দেন কেউ খোঁজ করলে। গুরুদেব যখন আসেন মধ্যে মধ্যে তখন স্ত্রীর শাসনে একটু বেশি পয়সা খরচ করতে হয়। অবশ্য তাতে তিনি পিছ-পা নন—প্রণামও করেন আসতে-যেতে তুবার, তবে দীক্ষা নিতে একেবারেই নারাজ। তিনি কথায় কথায় (কখনও বা গুরুদেবকে শুনিয়েই) নারদের তুধের বাটির গল্প করেন। দেবর্ষি নারদের মনে বড় অহঙ্কার ছিল ঈশ্বরের ভক্ত বলে। ক্রমশঃ সেটা এত প্রবল হয়ে উঠল যে ঈশ্বরের মুখে কথাটা না শোনা পর্যন্ত তাঁর শান্তি রইল না। একদিন তিনি গিয়ে ভগবানকে সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসলেন—'প্রভু এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আপনার শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে?' ভগবান ও'র মনের ভাব বুঝে একটু হাসলেন মনে মনে, বললেন, 'অমুক গ্রামে অমুক চাষী গৃহস্থ আছে—সে-ই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত!' নারদ খুব ক্ষুণ্ণ হলেন, অভিমানে তাঁর আঘাত লাগল। তিনি তখনই তাঁর ঢেঁকি-বাহনে চড়ে পৃথিবীতে এলেন এবং অদৃশ্য থেকে লোকটির জীবনযাত্রা সব লক্ষ্য করলেন। তারপর ভগবানের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, 'সে কি ঠাকুর, অমুক লোকটি ত একবারও আপনার নাম করে না, সেই হ'ল আপনার শ্রেষ্ঠ ভক্ত?' ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, 'একবারও কি করে না?—নারদ বললেন, 'হ্যাঁ করে—যখন কোন জিনিস অপচয় হয়—ভাঙ্গেচোরে কি অমনি কিছু—তখন শুধু একবার আপনাকে ডাকে মনে মনে, বলে, ঈশ্বর ক্ষমা করো! ভগবান বললেন, 'তাইত নারদ, তুমি দেখছি ভাবিয়ে দিলে। আচ্ছা আমি দেখছি; এখন তুমি একটা কাজ করো দিকি—এই একবাটি তুধ হাতে ক'রে ত্রিভুবন ঘুরে এসো ত একবার।

তোমার কাছে আর কতক্ষণের কাজ, ফিরে এসো তারপর উত্তর দেবো।...দেখো, দুধ না পড়ে কোথাও!' একবাটি ভর্তি দুধ। নারদ ত মহা বিপন্ন, ইচ্ছা করলেই ত্রিভুবন ঘুরে আসতে পারেন তিনি এটা ঠিক—কিন্তু দুধ যে চলকায়! অতিকষ্টে দুধের বাটি সামলে যখন তিনি ফিরে এলেন, ভগবান প্রশ্ন করলেন, 'বৎস নারদ, তুমি ত অহো-রাত্র হরিগুণ-গান করো—কিন্তু এই দুধের বাটি হাতে যখন ত্রিভুবন ঘুরছিলে তখন ত কই একবারও আমাকে ডাকোনি!' নারদ রেগে জবাব দিলেন, 'ঠাকুর, বলো কোন্ লজ্জায়! এক বাটি ভর্তি দুধ দিয়েছ —বলেছ চলকে না পড়ে। আমি তোমার দুধ দেখবো না তোমাকে ডাকবো। তোমার কাজেই ত আমি বিব্রত।' ভগবান্ বললেন, 'ঐ তোমার জবাব নারদ। ঐ ভক্তটি তার সমস্ত কাজই আমার কাজ বলে জানে—তাই একমনে সেই কাজই করে, যখন ভুল ক্রটি হয়, তখনই শুধু আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আমাকে আর আলাদা ক'রে ডাকবার ওর প্রয়োজন হয় না।'

এই গল্পটি শুনিয়ে উনি বলেন, 'আমার এ সংসারও সেই নারদের দুধের বাটি!' এই বলে হা-হা ক'রে হেসে ওঠেন। আড়ালে বসে গুরুদেব বলেন, 'একটু তফাৎ আছে—সেই বিশ্বাসটি নেই!'

সে যাই হোক্—ছেলেমেয়েরা এটা জানে যে তাদের বাবা তাদেরই প্রসন্নতার জন্য তপস্যা করেন। আর সে জ্ঞানকে তারা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগায়—

ছোট মেয়ে উৎপলা যে দিন কণ্ঠে বিশ্বের মধু ঢেলে দিয়ে ডাকে, 'বাবু—' সেদিন সেজ ছেলে বলু ঘরের মধ্যে দাঁত কিড়মিড় ক'রে মেজদাকে বলে, 'শুনলে শুনলে মেজদা—আজ এমন একটা কিছু সাংঘাতিক ফরমাস করবে যে তিন চারদিন আর বাবুর কাছে কিছু

চাওয়াই যাবে না।'

মেজদাও চিন্তিত মুখে বলে, 'তাইতো আমি যার ভাবছিলুম যে ভাল গ্যাবার্ডিন্‌টা বাজারে এসেছে, এই বেলা বাবুকে বলে একটা স্যুট্‌ করিয়ে নেব—'

'ইস্‌, তুমি আমার আগে গ্যাবার্ডিনের স্যুট্‌ করাবে!···ও চেষ্টা করো না মেজদা, ভাল হবে না। এক বেলা না খেয়ে শুয়ে থাকলেই বাবু চোখে অন্ধকার দেখবে।'

'তুই থাম্‌। সব দফা পলি সেরে দিলে দেখগে যা—'

আর সত্যিই তাই দাঁড়ায়। উৎপলার মধু-ঝরা কণ্ঠের মূল্য কোন দিন দিতে হয় স্কুলে কোন মেয়ের দেখা জরির মিনে-কাজ-করা ঢাকাই শাড়ি, নয়ত লিচু কাটের বালা। ফলে দেবেনবাবুর বহুদিনের দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত বাজারে ঘোরার উপার্জন যায় শেষ হয়ে।

আবার বলু যেদিন 'বাপি' বলে ডাকে, সেদিন বুঝতে হবে কোন নতুন ধরনের জুতো দেখে এসেছে বাজারে—কিংবা, কোন দামী স্যুটের কাপড়। বলুর ভাষায় মেজদার টেক্‌নিক্‌ আলাদা—সে এসে রাত্রে বাপের কাছে শুয়ে বাবার বুকে হাত বুলোয়, বলে, 'বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছেন বাবু—এই কদিন ঘোরাঘুরিটা একটু কমান।'

তার উত্তরে বাবা ছেলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'এখন কমালে চলবে কেন বাবা, মেয়ে দুটোর বিয়ে দিই—তোরা রোজগার করতে সুরু কর, তবে ত।···এই ত তুই একটা মোটরবাইক কিনতে চাইছিস—বারো শ' টাকা হলেই হয়, তাও জানি—তবু ঐ সামান্য টাকাটাই জোগাড় হচ্ছে না!'

বড় ছেলে চাকরী করে কিন্তু অনাবশ্যক বোধেই বাবার হাতে কিছু দেয় না। তবু তাতেই তার অকুলান হয় মধ্যে মধ্যে—যে দিন খুব

ঠেকায় পড়ে সেদিন সে একটু ভাল কিছু খাবার (যার জন্য আট আনার বেশি খরচ হবার প্রয়োজন নেই) কিনে আনে এবং স্ত্রী বা মায়ের হাতে দিয়ে বলে, 'বাবুর জন্যে এনেছি, যত্ন করে তুলে রাখো।' তারপর বাবু বাড়ি ফিরলে অকারণ উচ্চকণ্ঠে স্ত্রীকে বার বার বলে, 'বাবুর জন্যে যে মিস্টিটা এনেছি মনে করে দিও কিন্তু, তোমাদের যে ভুলো মন!' আবার রাত্রে খেতে বসে বলে, 'বাবু ওটা খেয়েছেন? আপনার জন্যে সেই জোড়াসাঁকো থেকে নিয়ে এসেছি!'

বলা বাহুল্য, দেবেনবাবু প্রাণধরে সেটুকু খাবার একা খেতে পারেন না। ছোট ছেলে আছে, নাতি-নাতনী আছে—বড় জোর কোণ ভেঙ্গে একটু খেয়ে তুলে রাখতে বলেন।

এ হেন দেবেন বাবুরও চোখের রঙ্গীন ঠুলিটা একদিন খসে পড়ে গেল।

হঠাৎ, ভাত খেয়ে অফিস বেরোবেন, এমন সময় বুকে একটি ব্যথা ধরল, অসহ্য যন্ত্রণা, সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠল নিমেষে, দুই চোখে অন্ধকার দেখে সিঁড়ির ওপরেই বসে পড়লেন। সে যন্ত্রণা কাউকে বোঝাবার নয়, সে ক্ষমতাও ছিল না তাঁর। তিনি শুধুই ঙ্গিতে বুকটা দেখিয়ে দিলেন—বুঝিয়ে দিলেন যে নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

তখনই ডাক্তার ডাকা হ'ল। ডাক্তার এসে বললেন, 'থ্রম্বসিস্'। কখনও কি ব্লাড প্রেসার নেওয়া হয়নি?'

তার পর সুরু হ'ল যমে-মানুষে টানাটানি। বড় বড় ডাক্তারও এলেন, একজন আশ্বাস দিলেন, 'ফার্স্ট য়্যাটাক্ সাধারণতঃ মারাত্মক হয় না। সেকেণ্ড আর ফোর্থ হ'ল সবচেয়ে বিপজ্জনক। তবে বলাও যায় না, বুঝলেন ত, এ হ'ল যমের সঙ্গে টাগ-অফ-ওয়ার!'

মা বড় ছেলেকে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা জিতু—কিছু টাকা ত চাই। হাতে যা ছিল বাক্স-ফাক্স ঝেড়ে ঝুড়ে সব বেরিয়ে গেল—তিন দিনে পাঁচ'শ টাকা খরচ, বড় সোজা কথা ত নয়!'

'টাকা! আমি টাকা কোথা পাবো? আর তোমার কাছে কিছু নেই? বাবা চিরকাল এত টাকা রোজগার করেছেন—'

'বেশ বলছিস্। মাইনে ত পান দেড়শো টাকা, সে ত শুধু দুধের দাম, কয়লার দাম আর ঝিয়ের মাইনে দিতে চলে যায়! রোজগার করেন বলেই ত সংসারটা চলে, তোমরা ত কখনও কিছু দিলে না!'

'বাবা এখনও মরেন নি এরই মধ্যে তুমি বুঝি আমাদের ভাতের খোঁটা দিচ্ছ!' বড় ছেলে রাগ ক'রে বলে, 'আমার আয় ত জানো, জেনেশুনে বিয়ে দিলে কেন?'

'তোমার আয় বাবা এত কম নয় যে সংসারে এক পয়সা কখনো না দিয়েও তুমি কিছু জমাতে পারোনি! ছেলে-মেয়ের দুধের দাম দাও কোনদিন?...বৌকে একখানা শাড়ি এনে দিয়েছ?'

'সে দিলে ত আবার এক ঝুড়ি কথা শোনাবে।'

'বেশ ত —টাকা ত জমিয়েছ! সে টাকাটা ত খরচা হয়নি!'

'কিছু জমিয়েছি বৈকি! কিন্তু এই ত অবস্থা দেখছি, বাবা মলে চোখে অন্ধকার দেখতে হবে। এখনই এত কথা শোনাচ্ছ—তখন ত উঠতে বসতে খোঁটা দেবে। কিছু সঙ্গতি থাকা ভাল। সে এখন ভাঙ্গছি না।...তোমার ত স্বামী, তাছাড়া ওঁরই টাকা নিয়ে ত জমিয়েছ—এখন সে পুঁটুলিটি একটু খোল না!'

ঝনাৎ ক'রে চাবির গোছা ফেলে দেন চারুবালা—'কোথায় টাকার পুঁটুলি আছে খুলে দেখো না বাবা। থাকে বার করো। উনি কি আমার হাতে কোন দিন সংসার খরচের টাকা এনে দিয়েছেন যে

জমাবো? চিরকালই নিজে আনেন, নিজে খরচা করেন। কোন দিন চেয়ে চিন্তে দু'চার টাকা যা নিয়েছি সংসারের পেছনেই ঘুষ চলে গেছে। তা ছাড়া এই বাড়ি সারাবার সময়, মেয়ের গয়না গড়াবার সময়—যেখানে যা ছিল আমার হাত থেকে বার ক'রে নিয়েছেন—। থাকার মধ্যে আছে ওঁর এক পোস্টাফিসের বই, বারোশ' কত টাকা পড়ে আছে, এটা উনি বরাবরই বলেছেন কারুর তেমন ভারি অসুখ-টসুখ হ'লে কাজে লাগবে, নইলে কোন দিন হাত দেব না। তা এখন ওঁকে দিয়ে কী ক'রে সই করাব সে টাকা? ওঁর সই ছাড়া ত উঠবে না।'

মেজ ছেলে নরু প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'তুমি কি বলতে চাও যে ঐ পোস্টাফিসের ক-টা টাকা ছাড়া বাবুর আর কোথাও কিছু নেই?'

'কী থাকবে বাবা। তোরা ত এখনও কেউ এক পয়সা রোজগার করতে শিখলি না। এত বড় সংসার—তার ওপর ওঁর ছেলে-মেয়েদের অযথা আদর দেওয়া। তোদের নবাবী কি কম?'

সে কথায় নরুর কান ছিল না, সে যেন পড়ে যেতে যেতে একটা থাম ধরে নিজেকে সামলে নিলে—এমনি একটা ভঙ্গী ক'রে বললে, 'বাবা ত ইন্‌সিওরের টাকাটা পেয়েছিলেন!'

'তাতে দোতালার ঘর হ'ল না একখানা? বাড়ি মেরামত হ'ল—বাকি যা ছিল সব জড়িয়ে ত নির্মলার গয়না গড়ালেন। বললেন, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে—আরও ত ঢের লাগবে, যতটা এগিয়ে থাকে!'

'তাহলে বলো বাবা চোখ বুজলে আমরা পপার!...এমন অবস্থা জেনে তোমাদের এত নবাবী করা ঠিক হয়নি কিন্তু। তোমাদের সাবধান হওয়াই উচিত ছিল। ভবিষ্যতের কথাটা কখনও ভাবলেন না বাবা, আশ্চর্য! কেবল নিজের জীবনটাই ত সব নয়, ছেলে

মেয়েদের তিনি এনেছেন পৃথিবীতে, তাদেরও তো দায়িত্ব আছে।'

চারুবালা রাগ ক'রে বলেন, 'তোমরাই ত আবদার করতে বাবা—'

বলু সুদ্ধ ফোড়ন কাটে, 'তা আমরা কেমন ক'রে জানব। তাঁর আয়ের অঙ্ক তো আমাদের জানবার কথা নয়। আমরা ভাবি, অনেক আছে তাই খরচ করেন। এমন ক'রে আমাদের পথে বসিয়ে যাবেন তা কেমন করে জানব—'

চারুবালা চাপা গলায় গর্জন ক'রে ওঠেন, 'ও কি অলক্ষুণে কথা রে বলু।'

নরু বলে, 'না না—মিছিমিছি সেন্টিমেণ্টাল হয়ে কোন লাভ নেই। ফ্যাক্টস্ যা—তাকে ফেস্ করাই ভাল। ওরকম ওপর ওপর ভালবাসা বা আদর দেওয়ার কোন মানে হয় না। আমাদের ভবিষ্যৎটা ওঁর ভাবা উচিত ছিল না কি? এইত আমার ফোর্থ ইয়ার—এক বছর পড়লে তবে গ্র্যাজুয়েট, এখন আমার মূল্য কি? তাও ত আই এস-সি একবার ফেল করেছি, বি এস-সিও ফেল করতে পারি—বলা ত যায় না চান্স্-এর কথা। বলুটার ত সবে ফার্স্ট ইয়ার হ'ল। পলি, খোকন ইস্কুলে। চারিদিকে খরচ—কী ক'রে কি করব আমরা?'

চারুবালা তবু বলবার চেষ্টা করেন, 'এই খরচা ত সব ওঁকে জোগাতে হয়েছে বাবা। সত্যি, বাজে খরচা আর কতইবা করেছেন—।'

'না মা, তুমি যতই বাবাকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করোনা কেন—এটা বাবার ঠিক হয়নি।'

'তা সে না হয় ওঁর ঘাটই হয়েছে। এখন টাকার কি হবে বলো। চিকিৎসাত করতে হবে।'

'সেটাও সেই বুঝে করতে হবে। যখন সঙ্গতি নেই তখন বড় ডাক্তার ডেকে লাভ কি বলো! গরীব মানুষের চিকিৎসা সেইভাবে

করাই ভাল। পাড়ার তারিণী ডাক্তারকে ভরসা করেইত অনেকে পড়ে থাকে, বিধান রায় কি রায়চৌধুরীকে কে কতো ডাকতে পারে বলো—!'

মেজছেলে নরু প্রাজ্ঞের মত বুঝিয়ে বলে।

চারুবালা বড় ছেলের দিকে চেয়ে বলেন, 'তুমি তাহ'লে কিছুই দেবেনা বাবা?'

মুখ গোঁজ করে জিতু বলে, 'একশো টাকা আমি তুলে দেব পোস্টাপিস থেকে। তার বেশী কিছু আশা ক'রনা। এক আধখানা গয়না বাঁধা দাও না হয়, আর কি করবে!'

চারুবালা স্তম্ভিতের মত বসে থেকে বলে, 'তাই হয়ত দিতে হবে কিন্তু আমারও তো ঐ পুঁজি বাবা, তোমাদের যা মতিগতি আমাকে যে একমুঠো খেতে দেবে তোমরা, তাও ত মনে হয় না! মেয়ে দুটো আছে, খোকন, বলু—'

'বাড়ীখানা আছে তোমার নামে ভুলে যাচ্ছ কেন মা। একতলা ভাড়া দিলেও এ বাজারে বিস্তর পাবে। আমাকে যদি আজ তুমি তাড়িয়ে দাও, স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে কোথায় দাঁড়াবো বলত? সে ভাবনাও ভেবে রাখতে হচ্ছে যে!'

রোগীর পাশের ঘরে যখন এই নাটক অভিনীত হচ্ছে তখন রোগী অর্থাৎ দেবেনবাবু ঠিক অজ্ঞান হয়ে ছিলেন না, যদিও এরা তাই ভেবেছিল। বাক্‌শক্তি না থাকলেও শ্রবণ-শক্তি তাঁর ছিল ঠিকই। সব শুনলেন কিন্তু কথা কইতে পারলেন না। শুধু দুচোখের কোণ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। খানিক পরে চারুবালা এ ঘরে এসে যখন তাঁর নিমীলিত চোখের কোণে জল দেখে প্রশ্ন করলেন,

'হ্যাঁ গা, বড্ড কি কষ্ট হচ্ছে ?'

দেবেনবাবু উত্তরে একবার চোখ মেলে তাকালেন শুধু, ইঙ্গিতে বুকটা দেখিয়ে দিলেন, কথা কইতে পারলেন না।

'তাইত ! কে একটু বসে কাছে, বৌমার মেয়েটা কাল থেকে একজ্বরী হয়ে আছে, আমি তো রান্নাঘরে। ওরে অ নির্মল, একটু বোসনা মা বাপের কাছে—'

'আমি পারব না মা, বাবার ঐরকম কষ্ট সহ্য হয়না আমার। দেখলেই কেমন যেন গা-গুলোতে থাকে···

দৈবের বিচিত্র নিয়মে দেবেনবাবু কিন্তু এ ধাক্কা সামলেই উঠলেন শেষপর্যন্ত। ডাক্তাররা সতর্ক করে দিলেন, 'খুব সাবধান তবে—জানেন ত বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা ! বরং কোথাও বাইরে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম যদি নিতে পারেন ত—'

ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি ফুটল। আবার প্রসন্ন জীবনযাত্রা সুরু হয়ে গেল।

নরু বললে, 'বাবা আপনি না হয় আরও দিনকতক ছুটি নিন—'

দেবেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ তাই নিতে হবে। একেবারেই ছুটি নেব ভাবছি।'

নিমেষে মুখ শুকিয়ে ওঠে নরুর, 'না—মানে অফিসের ফেরৎ অত রাত পর্যন্ত ঘোরাঘুরিতে বড্ড স্ট্রেন হয়, আমি বলছিলাম যে ওটা বন্ধ রেখে শুধু যদি দিনকতক অফিসটা করতেন ত ভাল হ'ত।'

একটু হাসলেন দেবেনবাবু। কথা কইলেন না।

জিতু বললে, 'তারচেয়ে বরং দিনকতকের জন্য চেঞ্জে যান। সুস্থ হয়ে ফিরে এলে সব কাজই করতে পারবেন। মা না যেতে পারেন, আপনার বৌমাকে নিয়ে যান—আমিও বরং শ'খানেক টাকা দিচ্ছি।

ওর শরীরটা খারাপ যাচ্ছে অনেকদিন থেকেই, সুযোগ ত হয় না।'

গৃহিণী আড়ালে বললেন, 'বরং পলিকে নিয়ে তুমি কোথাও চলে যাও। দুজনের মত রান্না পলি পারবে 'খন।···বৌমা গেলেই ছেলে-মেয়ে যাবে—ঝঞ্ঝাট আর খরচ—উনি ত একশো টাকা দিয়ে খালাস।

দেবেনবাবু হাসলেন। হাঁ-না কিছুই স্পষ্ট পাওয়া গেল না তাঁর কাছ থেকে।

আরও দিনকতক পরে একটু সুস্থ হয়ে উঠে দেবেনবাবু বললেন, 'আমার এক বন্ধুর বাড়ি আছে শিমুলতলায়, সেইখানেই যাবো মনে করছি। তাঁরাও যাচ্ছেন—কোন অসুবিধা হবে না!'

'কেউ সঙ্গে যাবে না?'

'না। পরের বাড়ি, নিজে যাচ্ছি আবার সঙ্গে কাউকে নিলে কি ভাববে!'

সবাই মিলে বাক্স-বিছানা গুছিয়ে দিলে; নানা ওষুধ গেল সঙ্গে। সকলে মিলে বার বার সতর্ক করে দিলে—খুব সাবধানে থাকবার জন্য। বলু গিয়ে পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে তুলে দিয়ে এল।

দিন দুই পরেই দেবেনবাবুর পৌঁছানো সংবাদ এল কিন্তু শিমুলতলা থেকে নয়—কাশী থেকে।

তাতে লেখা ছিল ঃ

"আমার পরম কল্যাণীয় ছেলেমেয়েরা,

তোমরা শুনিয়া দুঃখিত হইবে, আমি চাক্‌রী একেবারেই ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছি। আর কখনও করিব না, আর বাড়িতেও ফিরিব না। আমাকে খোঁজ করার বৃথা চেষ্টা করিও না—কারণ এ চিঠি তোমাদের হস্তগত হইবার বহুপূর্বেই কাশী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। যাহা করিয়াছি তাহা অনেক চিন্তার পরই করিয়াছি—সেজন্য অনুতপ্ত নহি।

ঈশ্বর এই অসুখের পর সব দিক দিয়াই নবজন্ম দিয়াছেন—জ্ঞাননেত্রও খুলিয়া দিয়াছেন। উদয়াস্ত তোমাদের সেবা করিয়া দেখিলাম—এখন হইতে উদয়াস্ত তাঁহারই সেবা করিব এই ইচ্ছা। অফিসের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকাটা তোমাদের মাকে দিতে বলিয়াছি। মেয়ের বিবাহ যা-হয় করিয়া ঐ টাকাতেই হইবে। আমি ত মরিতেই বসিয়াছিলাম—মরিলে যেমন করিয়া চলিত তেমনি করিয়াই চলুক। আমার এ জীবনে পূর্বজন্মের দায়িত্ব আমি স্বীকার করিনা। তাছাড়া আমার সব চেয়ে বড় কর্তব্য আমার নিজের প্রতি, এ কথাটা সম্প্রতি বুঝিয়াছি।

আর একটি কথা বলিয়া চিঠি শেষ করিব। মনে করিও না আমি সন্ন্যাসী হইয়া আসিয়াছি। কিছু টাকা দুর্দিনের জন্য সকলের অগোচরে সরাইয়া রাখিয়াছিলাম—যদি কোন কারণে পঙ্গু হইয়া থাকিতে হয় কিছুকাল, সেই চরম দুঃসময়ের জন্য। তোমাদের এতটা হৃদয়হীন ভাবি নাই—তবে তোমাদের ক্ষমতার উপরও কোন আস্থা ছিল না। সে টাকাটা খুব বেশী নয়, আট ন' হাজার মাত্র। তবে তাহাতেই আমার বাকি দিন-কয়টা ঈশ্বরের নাম করিয়া কাটিয়া যাইবে বলিয়া মনে করি।

আমার আশীর্বাদে যদি কোন প্রয়োজন থাকে বলিয়া মনে করো ত গ্রহণ করিতে পারো। তবে এ জীবনে আর আর্থিক মূল্য-যুক্ত কোন সদিচ্ছা আশা করিও না। ও চক্রে আর পড়িবার ইচ্ছা নাই। ইতি—

আশীর্বাদক

তোমাদের পিতৃনামধারী

দেবেন্দ্রনাথ"

বলু বললে, 'স্বার্থপর !'

জিতু বললে, 'ইরেস্‌পন্‌সিবল্‌ !

নরু বললে, 'আন্‌গ্রেট্‌ফুল ক্রীচার ! অকৃতজ্ঞ, বেইমান ! আমাদের কাছ থেকে কি কিছুই পাননি তিনি ! এতদিন তবে কী নিয়ে ভুলে ছিলেন ? জীবনে যে-কোন রকমে আনন্দ আর তৃপ্তি পেলেই হ'ল !'

চারুবালা বললেন, 'কিন্তু আমাদের এখন কি হবে ?'

সকলেই নির্বাক। ঘড়িটা শুধু নিঃশব্দে টক্‌ টক্‌ করতে লাগল ঘরের মধ্যে।

একান্নবর্তী

হালুয়াটার ভাগ নিয়েই মনোমালিন্যের সূত্রপাত। ভাগ্নী খেঁদি বড়বৌকে ডেকে বলেছিল, 'বড় মামীমা, তাহলে হালুয়াটা কী রকম ভাগ করব ?'

'তার মানে ?'—সত্যিই অতটা বুঝতে পারেনি বড়বৌ।

'না—মানে অন্য দিন ত সব সমান সমান দাও তোমরা—আজ বাপু তিন ঘর থেকে তিন জিনিস বেরিয়েছে, মেজ মামী দিয়েছে ঘি, তুমি দিয়েছ সুজি, ছোট মামী চিনি—সমান ভাগ করব ? কিন্তু দামের কথা যদি ধরো, ঘিয়েরই দাম সবচেয়ে বেশি, মেজ মামীর তাহলে একটু বেশি পাওনা হয়। ও বাপু আমি বুঝতে পারছি না! তার চেয়ে তোমরা এসে ভাগ-যোগ ক'রে নাও—'

কথার মধ্যে ইচ্ছাকৃত খোঁচা ছিল বৈ কি! যতটা সরলভাবে খেঁদি বলতে চাইছে ততটা সরল সত্যিই ও নয়—বিশেষত এখন সে সবটা জেনে শুনেই অপদস্থ করতে চাইছে। পাড়ার নতুন বড় বাড়িতে ঘোষালরা এসেছেন মাত্র ন'দিন—সেই ঘোষাল গিন্নী আজই সবে এ বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। তাঁর বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রের বিস্ময় ও কৌতূহল লক্ষ্য ক'রে বড়বৌয়ের আরও বেশি মাথা গরম হয়ে গেল। সে কাছে এসে ঠাস্ ক'রে খেঁদির গালে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমার আস্পদ্দা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, না ? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমার সঙ্গে ইয়ার্কি!'

অতবড় মেয়ের গায়ে হাত তোলা নিশ্চয়ই ঠিক হয়নি। তাছাড়া

ওর গায়ের রং ঠিক গৌর না হলেও, পাঁচ আঙ্গুলের দাগ না বোঝবার মত কালোও নয়। কিশোরী মেয়ের নরম গালে পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ নীল হয়ে ফুটে উঠল।

খেঁদি কাঁদলে না। জলভরা চোখে একবার সকলের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু ক'রে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। ফলে কিন্তু লজ্জার কারণটা আরও বেড়ে গেল। ঘোষাল গিন্নী হাঁ হাঁ ক'রে উঠলেন, 'ও কি করেন, ও কি করেন। ছিঃ! বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে—ওদের গায়ে কি হাত তুলতে আছে!'

তার ওপর রসান দিলেন মাসিমা, দালানের ও প্রান্ত থেকে কাংস্য-বিনিন্দিত কণ্ঠ তাঁর বেজে উঠল,—'ওর অপরাধ কি গা বড় বৌমা! কী মিছে কথাটা ও বলেছে? তোমাদের সংসারের যা হালচাল তাই না হয় পষ্ট ক'রে বলেছে। তাই বলে অত মাথা গরম করা কি তোমার ঠিক?'

'আপনি চুপ করুন, মাসিমা। যা বোঝেন না—'

'চুপ ক'রেই ত আছি বৌমা। কবে আর কি বলছি বলো। তবে যদি মনে করে থাকো যে কিছু বুঝি না, সেটা তোমার ভুল। সবই বুঝি মা—নিহাৎ উপায় নেই বলেই পড়ে থাকি। আমরা দুটি প্রাণী হয়েছি তোমাদের সকলেরই চক্ষুশূল। কিন্তু তাও বলি বাছা—আমরা আছি তাই কিছু টের পাচ্ছো না, নইলে তিন হাঁড়ি তিন ঠাঁই হ'তে আর দেরি নেই। আর তাহলে তিনজনকেই তিনটি দিনরাতের ঝি আর ঠাকুর রাখতে হবে, তা বলে দিচ্ছি।'

খেঁদিকে শাসন করা সোজা কিন্তু বয়স্কা মাসিমাকে থামাবার কোন উপায় নেই। যা ঢাকতে চাইছিল তাই-ই যেন কদর্য কর্কশ রূপ নিয়ে বেশি ক'রে ফুটে উঠল। রাগে দুঃখে বড় বৌয়ের চোখে জল এসে গেল।

এই অবস্থায় বাঁচালে মেজবৌ, সে ছুটে এসে এক রকম ঠেলেই বড় জাকে ওপরে উঠিয়ে দিলে, 'দিদিমণি, ছোট খোকাটা যে সেই থেকে কেঁদে কেঁদে গেল। আপনি যান শিগ্গির—আমি ওদের খাবার ভাগ ক'রে দিচ্ছি।'

তারপর ঘোষাল গিন্নির দিকে চেয়ে মধুক্ষরা কণ্ঠে বললে, 'আপনি ভাই ওখানটায় বসে পড়েছেন? চলুন ওপরে যাই—ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে দিতে কথা কইব। প্রকাণ্ড বাড়ি করেছেন, এইবার একটা ভোজটোজ দিন। নইলে আপনারা আমাদের পাড়ায় এসেছেন বুঝব কেমন ক'রে?' ইত্যাদি—

ব্যাপারটা হ'ল এই। বাঁড়ুয্যেরা তিন ভাই-ই একান্নবর্তী। অর্থাৎ তিনটি পরিবারের রান্নাটা হয় একটা হাঁড়িতে, এক জায়গায়। তার সুবিধা ঢের, কারণ এক বিধবা মাসি এবং অনাথা ভাগ্নীকে যখন পুষতেই হয় তখন রান্নার ব্যাপারটা একত্র থাকায় ঐ দুটি প্রাণীর ওপর দিয়ে রাঁধুনী রাখার খরচাটা চ'লে যায় অনায়াসে। খাওয়া-পরা ছাড়া তাদের মোটা মাইনে দিতে হ'ত—এদের তা দিতে হয় না।

অবশ্য বৌরাও রান্নাঘরে আসে। সকালে একটু বেলায় উঠে ছেলে-মেয়েদের দেখে শুনে খাইয়ে নিজেরা কাপড়-চোপড় কেচে এসে যখন রান্নাঘরে ঢোকে তখন বাড়ির তিন কর্তাই আপিস বেরিয়ে যায়। মানে সাড়ে নটারও পর। তখন রান্নার কাজ অল্পই বাকি থাকে। জলখাবারও ইতিমধ্যে খেঁদি তৈরি ক'রে রাখে। ওরা তিন বৌ এলে চা তৈরি হয়—সকলে মিলে জলখাবার খেয়ে উঠতে উঠতে দশটা, সাড়ে দশটা। তখন মেজবৌ বলে, 'মাসিমা, কুট্নো কিছু বাকি আছে কি?' আর ছোটবৌ বলে হয়ত, 'মাসিমা, আপনি যান আহ্নিকটা সেরে আসুন গে

—আমি দেখছি।' তখন মাসি গিয়ে স্নান ক'রে আহ্নিক পূজো সেরে এসে একটু কিছু মুখে দিয়ে জল খান, তারপর খেঁদি উনুনটা নিকিয়ে হেঁসেল ধুয়ে দিলে নিজের নিরামিষ রাঁধতে বসেন। বিকেলেও খেঁদি আগে এসে দুধ, ছেলেমেয়েদের জলখাবারের ব্যবস্থা, গিন্নীদের চা খাবার ক'রে এক-আধটা তরকারী চাপিয়ে দিলে বৌয়েরা একে একে দেখা দেয়। তারপর ঘণ্টাখানেক পরে মাসি এসে আটা মেখে রুটি বেলে দিতে বসেন, খেঁদি সেঁকতে থাকে—তখন বৌয়েরা ওপরে উঠে যায় আবার। ছেলেমেয়েদের খাওয়ানো আছে, ঘুম পাড়ানো আছে—নেই কি ?

তবু এক হাঁড়ি—এটাই কি কম !

কিন্তু বিপদ হচ্ছে, খরচের কেন্দ্রটা এক নয়। বোধ হয় কোন ভাই-ই কোন ভাইকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না—এটাই তার কারণ। বড়ভাই দেয় ট্যাক্স, খাজনা, ঝি-চাকরের মাইনে, ইলেকট্রিক, কয়লা, ঘুঁটে, মশ্‌লা, ডাল ইত্যাদি, মেজভাই দেয় দৈনিক বাজার, এবং ছোট-ভাই দেয় রেশন ও তেল। তেলের খরচ ত কম নয়—মাসে ষোল সের। এর মধ্যে প্রত্যেক ভাইয়েরই বিশ্বাস সে অপর দুই ভাইয়ের চেয়ে বেশি খরচ করছে। অবশ্য এই মোটা খরচগুলো বাদে বাকি সব খরচাই যে-যার নিজে বহন করে। চিনিটা রেশনের অঙ্গ কিন্তু চিনি নিয়ে প্রায়ই বিবাদ বাধত বলে (অর্থাৎ বড়র ছেলেমেয়ে বেশি—সে-ই বেশি চিনি খরচ করে এই সংশয়) চিনি প্রত্যেকেই নিজে নিয়ে নেয়, নিজেদের ঘরে রাখে। ছেলেমেয়েদের খাবার, দুধ, ধোপা সব স্বতন্ত্র। মাসি আর খেঁদির ধোপার খরচ বহন করে ছোটবৌ—মাসির একাদশীর একপো দুধ তিন বৌ নিজেদের থেকে একটু করে দেয়। এ ছাড়া ঘি-ও যে যার নিজের ঘরের। সে জন্য ডাল তরকারীতে ঘি পড়ে না

কোন দিন। কোন বৌ যদি বিশেষ কোন রান্না রাঁধতে বসে তাহ'লে সে বাহবা নেবার জন্যে নিজের ঘর থেকে বার করে ঐ বস্তুটি।

তাহোক—এই ভাবেই একান্নবর্তী পরিবারের গৌরব ত বজায় রেখে চলেছে এরা!

বিপদে পড়ে সবচেয়ে খেঁদিই। জলখাবারের পরোটা হয় একত্রে, অথচ সংসারের কোন ঘি নেই। খেঁদিকে প্রতি ঘর থেকে চামচ মেপে মেপে ঘি নিয়ে আসতে হয়। হালুয়া হ'লে সব ঘর থেকেই সমানভাগে সুজি চিনি ঘি বেরোয়। তিনবাবু কি তিনবৌ একসঙ্গে খেতে বসলে তিনটে মাখনের কৌটা নিয়ে আসতে হয়, আবার চিহ্ন করে রাখতে হয় কোন্ ঘরের কোন্টা। রাত্রে দই পাততে হলে তিন বৌকে দেখিয়ে দুধ নিতে হয় মেপে। নইলে সামান্য একটা কথা থেকে অনেক কথা এবং বাঁকা কথার সৃষ্টি হয়।

সেই দুঃখ আর ক্ষোভটাই যদি খেঁদির মুখ থেকে আজ বিদ্রূপের আকারে বেরিয়ে থাকে ত তাকে দোষ দেওয়া যায় কি?

রাত্রে তিন ভাই-ই বাড়ি এসে শুনলে কথাটা।

বড়বৌ বললে, 'এ অপমান আমার বরদাস্ত হয় না বলে দিলুম! যা হয় একটা বিহিত করো!'

'কী বিহিত করব? আইবুড়ো ভাগ্নীকে তাড়িয়ে দেব? বড় জোর একটু বকে দিতে পারি। কিন্তু তুমি ত তার আগেই শাস্তি দিয়ে বসে আছ। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে লাভ কি?'

'তা কেন—কিন্তু এই কেলেঙ্কারী, ঘোষাল গিন্নীর সামনে—ছি ছি!'

'কেলেঙ্কারীর কারণটা দূর করলেই পারো। তোমরা ঝগড়া ঝাঁটি

করেই ত ব্যাপারটাকে এই দাঁড় করিয়েছ—ভাগযোগ কত কি !'

'আমরা করেছি !' বড়বৌ রাগ করে, 'মেয়েছেলে অমন একটু তক্ক-বিতক্ক হয়ই। তোমরা দাঁড়িয়ে থেকে সব করালেই পারো। একসঙ্গে হিসেব রেখে এক গেরস্তর বাজার-হাট করা, সেটাও ত করলে পারো—কৈ, তাও ত হয় না।'

'তাতে ঝগড়ার বীজটা যাবে কি ? সেই ত মাপ-জোক নিয়ে ঝগড়া বাধাবে !'

'বেশ গো বেশ ! আমিই দিনরাত ঝগড়া করছি !···দাও না আমাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে। মনের সুখে থাকো না ভাই-ভাজদের নিয়ে !'

বৃথা জেনে বড়ভাই প্রফুল্ল আর কথা কইলে না। একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললে মাত্র।

মেজবৌ তার স্বামী সন্তোষকে ঠিক ঐ কথাটাই তখন বলছিল, 'সামলে নিলুম বটে আমিই—কিন্তু লজ্জায় যেন মাথা কাটা গেল। এর একটা যা হয় বিহিত করো বাপু !'

'কী বিহিত করব বলো ! আসল মূল যেটা সেটা ত দূর করতে পারবে না। ঠিক মত বিহিত করতে গেলে তিনটি হাঁড়ি আলাদা করতে হয়।'

'তাই না হয় করো—কী আর কম খরচা হচ্ছে আমাদের ?'

'অনেক কম খরচা হচ্ছে। যা আছে তা ত থাকবেই তাছাড়া মনে করো ঝি-চাকর, টেক্স-খাজনা, ইলেক্‌ট্রিক-ঘুঁটে-কয়লা—সমস্তই প্রত্যেককে খরচ রাখতে হবে। আর এই ত জায়গা, তিনটে পৃথক্ সংসার ধরাবই বা কোথায় ? তিনটে ভাঁড়ার, তিনটে রান্না শুধু নয়—কয়লা-ঘুঁটে রাখবারও তিনটে জায়গা—'

'বেশ ত, এরই মধ্যে যাতে মানায় তোমরা দাঁড়িয়ে থেকে একটা কিছু ব্যবস্থা ত করতে পারো !'

'হ্যাঁ—ঐটেই বাকি আছে। তোমরা ঝগড়া পাকাবে আর আমরা ব্যবস্থা করব। বাইরে থেকে টাকা রোজগার করব—চাকরী আছে, টিউশ্যনী আছে—আবার দাঁড়িয়ে থেকে সংসার করব !'

'বেশ বেশ। আমরাই খালি ঝগড়া বাধাই আর তোমরা সাধুপুরুষ !'

পাশের ঘরে ছোটভাই আনন্দও এই কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করছিল, 'তাহ'লে সোজাসুজি পৃথক হ'তে হয় ! তা নইলে এ সমস্যার আর সমাধান হবে না কোন দিনই !'

'তাই হও না বাপু—কী আর বাকি আছে ?'

'ঢের আছে গো, ঢের আছে। যা খরচ করছি এর তিনগুণ খরচেও থৈ পাবো না। তারপর রান্না করতে পারবে ?··· এই চারটে ছেলেমেয়ে নিয়ে ?

'সে হয়ে যাবে একরকম ক'রে। মাসিমাকে আমাদের সংসারে নিয়ে নেবো !'

'হ্যাঁ—সেইটাই তোমার সুবিধা কিনা ! অপর ভাইরা মাসিমাকে ছাড়বে ?'

'কেন ছাড়বে না ? ওঁকে ত একজন না একজনকে নিতেই হবে।'

'ওঁকে নেওয়া যে সুবিধা, তা যেমন তুমিও জানো তেমনি ওরাও জানে। খেঁদিকে নিলে বিয়ে দেবার প্রশ্ন, ঠাকুর রাখলে মাইনে আছে—চুরি আছে।···না গো ঠাকরুণ, অত সোজা নয় ! বরং পারো ত নিজেরাই মানিয়ে নাও !'

কিন্তু সেটা যে সম্ভব নয়—অর্থাৎ তিনটে মেয়েছেলের একত্র মানিয়ে চলা—তা আনন্দও জানত। তাই রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সে-ই বাকি দুজনকে বাইরের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল।

'শুনেছ ত সব দাদা ?'

'শুনেছি বৈ কি।'

'এর কি একটা ব্যবস্থা করা যায় না ?'

'কী ব্যবস্থা করতে চাও ?' সন্তোষ প্রশ্ন করে।

আনন্দ একটু মাথাটা চুল্‌কে বললে, 'আমরা সবাই যদি সমান একটা টাকা ডোনেট্ করি—একটা সাধারণ ফাণ্ড্ ক'রে—ধরো দাদার কাছেই রইল—সব খরচ উনিই করবেন, হিসেবটা রইলো। যা কম পড়বে আবার আমরা সমান ভাগে দেবো !'

প্রফুল্ল বললে, 'সে কথা ত আগেও উঠেছিল। কিন্তু তাতে যে সমস্যা ঢের। আমার সাতটা ছেলেমেয়ে, তোমার চারটে, সন্তুর তিনটে। আইনত খরচা আমার বেশি হওয়া উচিত ! অথচ সেটার হিসেব বা কি ক'রে হবে ?'

'তা ছাড়া—' সন্তোষ বললে, 'তাতে স্বাধীনতা সকল দিক্ দিয়েই ক্ষুণ্ণ হবে। আমি হয়ত অনেকটা রেহাই পাবো, কিন্তু তেমনি এখন এক একদিন হাতে পয়সা থাকলে আমি পাঁচ-ছ টাকারও বাজার করি—ছেলে-মেয়েগুলো এটা-ওটা খেতে পায়, তখন ত আমার হাত থাকবে বাঁধা। যদি বা বেশি বাজার করি, তোমরা ভাববে এত নবাবীর কি দরকার ছিল ?'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আনন্দ বললে, 'রেহাই পাবে মানে ? তুমি কি ভাবছ তুমি বেশি খরচা করো আমাদের চেয়ে—আমাদের কত ক'রে পড়ে তা জানো ?'

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি থামিয়ে দেয়, 'আঃ। ও সব এখন থাক্। এই সব সমস্যার জন্যেই ত একান্নবর্তী পরিবার থাকে না। অথচ দ্যাখো—একান্নবর্তী পরিবারে সুবিধাই বেশি, নয় কি? আলাদা হওয়া মানে সম্পুর্ণ নতুন এস্টাব্লিসমেন্ট্। সবই ত চাই—দরকার নেই কি!… তাছাড়া লোক ছাড়াও ত সংসার চলে না। শেষ পর্যন্ত শ্বশুর বাড়ির লোক এনে সংসার ভরাতে হয়। পাড়ার মনো সান্যালকে ছাখো না—মেজদা একটু বেশি খরচ করে বলে রাগ ক'রে আলাদা হ'লো—তারপর? ওখানে বাড়ি ভাড়া দিত পুরানো আমল থেকে চল্লিশ—এখানে ছুখানা ঘর পঁয়ষট্টি। ঝি রাতদিনের, আরও ত সবই আছে পুরো সংসারের। তার ওপর একটি ক'রে শালীকে এনে রাখতেই হয়, কখনও কখনও তার ওপর শালা এবং শাশুড়ী।…না, না, ও কোন কাজের কথাই নয়!'

বেশ বক্তৃতা দেবার ভঙ্গীতে কথাগুলো ব'লে চুপ করে প্রফুল্ল। তিন ভাই-ই কিছুক্ষণ চুপচাপ। তিনজনেই ভাবছে একটা 'মেড্-ইজি' ব্যবস্থা—

শেষে আনন্দই বললে, 'আচ্ছা, জল খাবারটা একটা পুল সিস্টেম্ করলেই ত হয়। ঘি যখন কেনা হবে একেবারে দেড় সের কেনা হবে, আমরা প্রত্যেকে আধসের ক'রে দেব। ময়দা আটা ত রেশনে থাকেই, সুজি না হয় ঐ ভাবেই কিনে দেব সবাই মিলে!'

সন্তোষ বললে, 'চিনি?…যে দিন হালুয়া হবে?'

আনন্দ বললে, 'পরোটা চিঁড়ে ভাজা এই সবই ত বেশি হয়। বেশ ত হালুয়া যেদিন—এক এক দিন এক এক জনের ঘর থেকে পুরো চিনি নিলে হবে!'

সন্তোষ বললে, 'এ ব্যবস্থা মন্দ নয়।'

একটা উদার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রফুল্ল বললে, 'কিন্তু ভাই আমার ছেলেমেয়ে ত বেশি! সেটাও হিসেবে ধরা উচিত—'

উদারতার সে তরঙ্গ বোধ করি বাকি দুজনের মনেও এসে ধাক্কা জাগিয়েছিল, আনন্দ তাড়াতাড়ি বললে, 'রেখে দাও ওসব কথা। তুচ্ছ ঐ সব হিসেবের মানে হয় না।'

সন্তোষ বললে, 'তোমার ছেলেমেয়েরা কি আমাদের কেউ নয়? সবাই বাড়ির ছেলেমেয়ে, ব্যস্!'

সেই ব্যবস্থাই বাহাল হ'ল।

দিন পাঁচেক পরে কিন্তু সন্তোষ বাজার থেকে ডিম নিয়ে এল আলাদা ক'রে,—'ওগো ছ্যাখো আমাকে তোমাদের ও পরোটা-মরোটা দিও না। আমি আজ একটা মাম্‌লেট খাবো।'

সে দিন মেজবৌ কিছু বললে না। কিন্তু পরের দিনও ডিম খেতে চাইলে মেজবৌ চাপা তর্জনের সঙ্গে বললে, 'বেশ ত তোমার বুদ্ধি! ও ধারে তোমার ঘিয়েতে গোছা গোছা পরোটা হচ্ছে—আর তুমি আবার আলাদা ডিম খরচ করো রোজ রোজ!'

সন্তোষ একটু অপ্রতিভভাবেই বললে, 'রোজ রোজ আর কৈ! তাছাড়া শরীরটা কদিন ধরেই একটু দুর্বল লাগছে কি না, তাই!'

'বেশ ত পরোটাও খাও, ডিমও খাও।'

'আবার ত একটু পরেই ভাত খাবার সময় হবে—'

'তা হোক!'...

আনন্দর শরীর খারাপ—সে সেদিন জলখাবার খেলে না! কিন্তু পরের দিনও পেট খারাপের দোহাই দিতে ছোটবৌ বলে উঠল, 'আহা আহ্লাদ! এক তাল ক'রে হালুয়া হচ্ছে—তুমি খাবে না! তোমার

ভাগটা কি বেঁচে যাবে বলতে পারো? পাঁচ ভূতে ত খাবে! আজ তুমি খাও।'

'পেটটা খারাপ যে!'

'তা হোক। না হয় একটু জোয়ানের জল খেয়ে নেবে খাবার পর।'

এমনি ক'রে কয়েক দিন চলতেই ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ল। আবারও একদিন দেখা গেল ঘি এসে যে-যার ঘরে উঠেছে। আবার একদিন খেঁদিকে মেজবৌ-এর ঘরে এসে প্রশ্ন করতে হ'ল, 'মেজ মামী তোমাদের কী জলখাবার হবে বলো? বড় মামী ত হালুয়া হুকুম করলে!'

'তবে তাই করো! সুজি চিনি ঘি মাপ ক'রে নিয়ে যাও।—একেবারে এক পাকে হয়ে যাক্। পঞ্চাশ রকম আর কতক্ষণ ধরে করবে!'···মেজবৌ সহানুভূতির স্বরেই বলে।

পূর্ণকুম্ভ

হ্যাঁ—পূর্ণ কুম্ভই বটে। তবে পুণ্যের নয়—তুঃখের। এমন কি প্রায়শ্চিত্তেরও বল্‌তে পারেন।

কী বললেন ?···পাপটা কি ? পাপ না হ'লে প্রায়শ্চিত্ত কিসের ?

সর্বনাশ ! পাপের অভাব কি ?

প্রধান পাপ তুটি। এক নম্বর : আমার আত্মীয়স্বজনরা সকলেই কোন মতে তু'শ আড়াই শ' টাকা রোজগার করেন অথচ তাঁদের বৃহৎ পরিবার—আর আমি শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আপনাদের আশীর্বাদে সাড়ে ছ'শ' টাকা মাইনে পাই—পরিবারও ছোট। তুই : তাঁরা কলকাতায় কোন মতে মাথা গুঁজে পড়ে থাকেন আর আমি এলাহাবাদে ফাঁকা জায়গায় বেশ ভাল একখানা বাড়িতে বাস করি। অবশ্য এত কাল আমিও যে কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে অমনি একটা অন্ধকার ফ্ল্যাটে খাঁচায়-পোরা-বানরের মত বাস ক'রে এসেছি সেটা তাঁরা ভুলে গেছেন। আজ ত মাত্র বছর-চারেক হ'ল বদলী হয়ে এলাহাবাদে এসেছি এবং সাহেবের কৃপায় একটি ভাল কোয়ার্টার পেয়েছি। কিন্তু সেইটেই যে মস্ত অপরাধ। বিশেষ করে এলাহাবাদ এমন একটা শহর যে প্রায়ই বহু লোকের রাজধানী-যাতায়াতের পথে এটা পড়ে এবং সুখ-সৌভাগ্যটা দেখে গিয়ে গল্প করা চলে। যাঁরা আসেন—আত্মীয়-স্বজন কুটুম্ব এমন কি বন্ধুবান্ধব জানা-শোনা (তাঁদেরও ঐ ঐ)—দয়া করে এখানেই নামেন, স্নানাহার করেন, তত্নপরি টাঙ্গা ভাড়া নিজের গাঁট থেকে দিয়ে তাঁদের দ্রষ্টব্য স্থান

দেখাতে হয়, নৌকো ভাড়া দিয়ে ত্রিবেণীতে স্নান করাতে হয়—সুতরাং অধিক বলা বাহুল্য—ফিরে গিয়ে সবিস্তারে আমার 'স্বচ্ছল' অবস্থার গল্প ক'রে বাকি সকলের ঈর্ষাকে জাগ্রত করা ত তাঁদের কর্তব্যের মধ্যেই। বিশেষ ক'রে অতিথি এলেই বঙ্গললনারা আহারাদির ব্যাপারে বেসামাল হয়ে পড়েন। 'ওমা, এই দিয়ে কি খেতে দেওয়া চলে…হ্যাঁ গা—ভাল মাছ পেলে না? কাট্‌রাতে একবার পাঠাবে না কি জগদেওকে—? যদি একটু মাট্‌ন্ পাওয়া যেত!…তোমরা ত খসরুবাগ যাচ্ছই, আসবার পথে চক থেকে একটু মিষ্টি দই এনো। এ যা খোট্টার দেশের দই—এ কি ওঁরা খেতে পারেন?' ইত্যাদি—ফলে যাঁরা আসেন তাঁরা ভাবেন এই বুঝি আমাদের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার মান। তাঁরাও সেই ধারণাটা আবার যথাস্থানে পৌঁছে দেন। এমনি ক'রে পাপ বেড়েই যায়।

কিন্তু পাপ যতই জমা হোক্—প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ এতকাল মেলেনি কোন মতেই। আমার যাঁরা সত্যিকার আত্মীয়-স্বজন তাঁদের অধিকাংশই—'সদাগরী অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী' না হোন্—বড়বাবুও কেউ নন্। সকলেই কোন মতে সংসার চালাতে ব্যস্ত ও বিব্রত। আয়ের সঙ্গে ব্যয় মেলেনা প্রায় কারুরই। সুতরাং তাঁদের হাওয়া খেতে যাবার মত বাড়তি পয়সা থাকে না। এমন কি বোনাসের টাকা যা আসে মধ্যে মধ্যে—তার চেয়ে বেশী দেনা সেই ভরসাতেই ক'রে রাখা হয়—এঁরা শুধু চিনির বলদের কাজ করেন মাত্র। আর এমন কিছু দরের মানুষ নন্ যে দিল্লী যাতায়াত করার প্রয়োজন হবে পরের পয়সায়। অতএব ঈর্ষাতুর দীর্ঘশ্বাস ফেলে 'বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবেনা এত ঋণ?' প্রশ্ন করা ছাড়া উপায় ছিল না এতকাল।

এমন সময় এল এই কুম্ভ। পূর্ণ কুম্ভ।

এর কথা আলাদা। এ ঘটনা আলাদা। এ সম্বন্ধে হিসেব-নিকেশও আলাদা।

বিশেষ ক'রে এবারের যোগে এমন সব যোগাযোগ ঘটেছে যা নাকি গত একশ' বছরের ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যাবে না। কথাটা যদি বা না জানা থাক্‌ত, সরকার বাহাদুর সবিস্তারে বিজ্ঞাপন করছেন। জানাচ্ছেন যে কোন মতে এসে পড়তে পারলে আর কোন অসুবিধা নেই। স্নানের যা সুব্যবস্থা তাঁরা করছেন—হর্ষবর্দ্ধনের আমলের পর আর কখনও হয়নি।

সুতরাং যেতেই হবে। ভগ্নিপতির ভাই অথবা ভায়রা ভাইয়ের মামাকে ধরে যদি রেলের পাস পাওয়া যায় ত ভালই, নইলে বালা আছে হার আছে, ইনস্যুরেন্সের পলিসি আছে, বাঁধা দিলেই যাওয়া-আসার খরচ পাওয়া যাবে। আর, বিশেষ ক'রে সেখানে থাকা-খাওয়ার যখন এক পয়সা খরচ লাগছে না—অমুক ত আছেই—তখন আর এ সুযোগ ছাড়া কি ঠিক?

বহুদিন আগে থেকেই চিঠি আসতে শুরু হয়েছিল। গৃহিণীর মুখ ভার—আমার মুখ শুক্‌নো। অথচ উপায়ই বা কি? কেউই আমাদের অনুমতি প্রার্থনা করেন নি, সুবিধে অসুবিধের কথাও জানতে চাননি—শুধু জানিয়েছেন যে তাঁরা অমুক অমুক তারিখে এসে পৌঁচচ্ছেন অতএব নির্দিষ্ট সময়ে আমরা যেন গিয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকি।··· বারণ করব? সে কি সম্ভব? তবু পরীক্ষা-স্বরূপ একবার সে ক্ষীণ চেষ্টাও করলুম কিন্তু তার উত্তরে আর এক শুষ্ক চিঠি এল যে তাঁদের যাত্রা বন্ধ হবে না, আমি যেন অনুগ্রহ ক'রে কোন ধর্মশালা-টালায়

একটা ঘর ঠিক ক'রে রেখে স্টেশনে অপেক্ষা করি—স্টেশনে যাতায়াতের গাড়িভাড়া তাঁরা পৌঁছেই দিয়ে দেবেন। আশা করেন যে এটুকু উপকার অন্তত করতে পারব।

তা ত বটেই—চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ লোক যেখানে আসছে, আর মোট যেখানে চার পাঁচটি ধর্মশালা, সেখানে এটুকু উপকারে অসুবিধা কি?

অতএব সে চেষ্টা পরিত্যাগ করলুম। যে বাংলোয় আমি থাকি তাতে আমার ভাগে (অর্ধেকে থাকেন এক মাদ্রাজী পরিবার—তাঁদেরও বহু লোক আসছে) মোট চারটি ঘর। স্ত্রীকে নিয়ে এক 'কাউন্সিল অব য়্যাক্‌শ্যন্' বসানো গেল। স্থির হ'ল আমার শোবার ঘর আমি ছাড়ব না—কারণ আমার অফিসের বহু কাজ করতে হয় সেখানে বসে—বরং ড্রয়িং রুমের দামী ফার্ণিচার কিছু এনে সেখানে রাখা চলতে পারে, আর বাকি একখানা ছোট ঘরে আমার স্ত্রী ও দুই পুত্র কন্যা থাকবেন। এই দুটো ঘরে যতটা আসবাব ধরানো যেতে পারে ধরিয়ে অবশিষ্ট ছাদে চট চাপা দিয়ে রেখে দেওয়া হবে এবং ড্রয়িং রুম ও বড় শোবার ঘরটা একদম খালি ক'রে দেওয়া হবে। তাতে যে কজন যে ভাবে থাকতে পারেন থাকুন—আমাদের কোন দায়িত্ব নেই। আরও স্থির করলুম স্টেশনে যাওয়া হবে না, তাতে আত্মীয়রা রাগই করুন আর গোসা-ই করুন। পাঁচ সিকের টাঙ্গা ভাড়া তিন টাকায় উঠেছে—ক্রমে আরও উঠবে। তাছাড়া কোন্ ট্রেন কখন আসবে তা যখন কেউই জানেনা, তিন চার সাত ঘণ্টা লেট্ ত ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। (শেষের দিকে ১৭।১৮ ঘণ্টাও কেউ ধরত না)। তখন কাঁহাতক্ সময় নষ্ট করব? যিনি বা যাঁরা বাড়ি চিনে আসতে পারেন আসুন—নইলে অন্য যে ব্যবস্থা হয় ক'রে নেবেন তাঁরাই—আমাদের দায়িত্ব কি?

তবু—প্রথম স্নানের আগেই ছুটি ঘরে জনসংখ্যা দাঁড়াল মোট তেইশ—ছেলেপুলে নিয়ে। আরও বিপদ, প্রথম যাঁরা এসেছিলেন পরমানন্দে ছুটি ঘরই দখল ক'রে হাত পা মেলে বসলেন এবং আমার 'খোলা' বাংলোর ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন। কিন্তু তার পরের দিন আর একদল এসে পৌঁছতে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। যাই হোক্—তবু কোন মতে সে দিনটাও কাটল—বহু তকরারের পর মুখগুলি যথেষ্ট ব্যাজার ক'রে তাঁরা ছুঘরের তল্পী গুটিয়ে একটা ঘরে সংহত ক'রে নিলেন। কিন্তু ধুন্ধুমার বেধে গেল তারপর যখন আর একদল ক'রে আসতে লাগলেন। বেগতিক দেখে আমি ব্যবস্থা করলুম নিজের ঘরে চাবি দিয়ে ভোর বেলাই অফিস যাবো এবং স্ত্রীকে বললুম দূর থেকে টাঙ্গা আসতে দেখলেই সে যেন নিঃশব্দে পাশের মাদ্রাজী বাড়িতে সরে যায়।—অবশ্য তার ঘরেও চাবি দিয়ে।

কিন্তু আধুনিক বাংলায় একথাও 'অনস্বীকার্য যে—স্থানের সমস্যাটাই সব নয়। প্রথম অসুবিধাটা মিটে যেতে সকলেই পুনর্পৌনিক ঘোষণা শুরু করলেন যে 'যদি হয় সুজন তবে তেঁতুল পাতায় ন-জন।' —ঘর না জোটে দালান আছে, এমন কি উঠোনও আছে—রাস্তার চেয়ে ত ভাল। কত লোক ত স্রেফ রাস্তায় শুয়ে আছে। ছু একজন অযাচিত উপদেশ দিলেন, এই বেলা খান-ছুই ত্রিপল যেন ভাড়া ক'রে এনে রাখি, এর পর তাও পাওয়া যাবে না। আরও যদি লোক আসে, ঘরদালানে ত তিল-থোবার ঠাঁই নেই, আর এটা ত ঠিক যে গলাধাক্কা দেওয়া যাবেনা—তখন সত্যিই বাগানে তাঁবু ফেলা ছাড়া উপায় কি? ইত্যাদি—। কিন্তু আসল ব্যাপারটা সম্বন্ধে সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। রাস্তাতেই থাকুন আর লাটপ্রাসাদেই থাকুন, খাওয়াটা যে চাই সে সম্বন্ধে কারুর কোন উদ্বেগ দেখা গেল না, অর্থাৎ সেটা যে

আমার দায়িত্ব তা যেন বেদ-বাইবেলের মতই শাশ্বত সত্য। সংক্রান্তিটা কোন মতে চালানো গিয়েছিল, চুড়ামণি যোগের স্নান সেরেই গৃহিণী নোটিশ দিলেন যে তাঁর হাত একবারে খালি, আমি যেন আজই 'কিছু ব্যবস্থা' করি।

'সে কি গো?' এটা একেবারেই যে ভেবে দেখিনি তা নয় কিন্তু তাই বলে এত তাড়াতাড়ি? সত্যিই যেন আকাশ থেকে পড়ি, 'মোটে ত মাসের আঠার দিন আজ!'

'তা আমি কি করব বলো। লোক কতগুলি খাচ্ছে বলো দিকি? দুবেলা পঁয়ত্রিশ দুগুণে সত্তর। আমি কি আশমান থেকে এনে জোগাব?···না কি দ্রৌপদীর থালা আছে আমার কাছে?'

যুক্তি অকাট্য। কিন্তু আমিই বা কি করি? এই ত কলির সন্ধ্যা। এখনও আসল স্নান— অমাবস্যার স্নানই বাকি!

আমাকে নিরবে তাঁর ঝঙ্কার সহ্য করতে দেখে গৃহিণী বোধ করি একটু নরম হলেন, কিছু কোমলকণ্ঠে বললেন, 'তুমি আর কি করছ! আমাদের হরিকেশব বাবুর কথা ধরো দিকি। ঐ ত পত্রিকা অফিসের চাকরী—দেড়শ দুশো টাকা মাইনে পান ভদ্রলোক। কোন মতে দুখানা খোলার ঘরে মাথা গুঁজে থাকেন—তাতেই সতের জন এসে উঠেছে। কাল ওঁর স্ত্রী এসেছিলেন আমার কাছে বালা বাঁধা দিয়ে টাকা ধার করতে। বলে আমিই কোথায় কী বাঁধা দিতে যাই তার ঠিক নেই—আমার কাছে এসেছেন উনি।'

'তুমি কি বললে?'

'বললুম পোদ্দারের দোকানে যেতে—তা নইলে কেউই এখানে দিতে পারবে না। কী হিন্দুস্থানী কী মাদ্রাজী সকলেরই ত এক অবস্থা।'

তা বটে।

তবু একথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া চলত যে অবস্থানের অবস্থাটা এক হ'লেও আতিথ্যের ব্যবস্থাটা এক নয়। মাদ্রাজী পাঞ্জাবী বিহারী—কোন দেশের লোকই বাঙ্গালীর মত অবাঞ্ছিত অতিথির আহারের ব্যবস্থায় এতটা 'আদিখ্যেতা' করেন না। বরং খরচা কমিয়েই ফেলেন। কিন্তু এসব কথা বলে কোনই লাভ নেই—লোকসান আছে। যেটুকু শান্তি এখনও আছে সেটুকুও যাবে।

বরং রসিকতা ক'রে বলি, 'দ্রৌপদীর থালা পাওয়া কঠিন কিন্তু দ্রৌপদীর পদ্ধতিতে যদি আয়টা পাঁচ গুণ ক'রে ফেলতে পারো ত মন্দ হয় না।'

গৃহিণী আবারও ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'ওসব ন্যাকামো করবার আমার সময় নেই। আমি মরছি নিজের জ্বালায়—উনি বসলেন রসিকতা করতে। রস উছলে উঠছে একেবারে!'

অগত্যা চেপে যেতে হয়। যত জ্বালাতন ওঁরই। ঠাকুর চাকর আছে, আর একটি বেড়েছে এই ক'দিনের জন্য—তাতেও উনি জ্বালায় মরছেন আর আমাকে যে নিজের ঘর থেকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে সেটা কিছু নয়!

কিন্তু রাগ অভিমানেরই বা সময় কৈ। টাকা চাই এখনই।

পোস্ট অফিসে ক'টা টাকা ছিল দুর্দিনের জন্যে। তাই থেকে আড়াই শ' টাকা এনে গৃহিণীর হাতে দিয়ে বললুম, 'এইতেই চালাতে হবে এই ক'টা দিন।'

'ও মা এতে কী হবে? এ ত' পাঁচ দিনের খরচ। জিনিসপত্র দিন

দিন যেরকম ছুর্মূল্য হচ্ছে—পাঁচদিন চললে হয়। এতগুলি তোমার গেস্ট আসবে যখন জানোই, আগে থাকতে মালপত্র কিনে স্টক করা উচিত ছিল!'

আবারও অনেক কষ্টে চুপ করে থাকতে হ'ল। অতিথি সব আমার তরফের নয়—তা'ছাড়া তিনিও যেমন জানতেন আমিও তেমনি জানতুম; এমন শুভ খবরটা আগে জেনেও চুপ ক'রে ছিলুম এ অভি-যোগের কোন কারণ নেই। এতগুলি প্রাণীর চাল-ডাল-ঘি-তেল-আটা-ময়দা-আলু কিনে রাখতে গেলেও আর একটা বাড়ি ভাড়া করতে হ'ত—ইত্যাদি অনেক কথাই বলা চলত, কিন্তু বলব কাকে? শুধু শুধু মেজাজ খারাপ ক'রে লাভ কি?···

অত্যন্ত অপ্রসন্ন চিত্তে পরের দিন অফিসে গেলাম। ভোর বেলা এক গ্লাস (কাপ সব ভেঙেছে) কড়া চা ও খানিকটা পুলটিশ (হালুয়ার অপভ্রংশ—আমার খোকা এই নাম দিয়েছে পদার্থটার) খেয়ে অফিস যেতে হয়, তারপর বাড়ি থেকে ভাত যাবার কথা কিন্তু সে যে কখন যাবে তার ঠিক নেই। চাকরের সময় হওয়া চাই ত! বাড়ির কর্তাকে খাবার পৌঁছানো-রূপ অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় কাজ ছাড়াও ত ঢের কাজ আছে তার! অফিসের ধারে-কাছে কোন দোকান নেই—কারণ এটা 'সিভিল লাইন্‌স্‌'। সাইকেল-পিওন পাঠানো চলত কিন্তু রাস্তাঘাটে এত ভীড় যে একবার কাউকে বাইরে পাঠালে তিন ঘণ্টার আগে ফিরে আসবার সম্ভাবনা নেই। তাতে অফিসের কাজের ক্ষতি হয়। গত কাল এই পুলটিশ খেয়েই সারাদিন কাটাতে হয়েছে—আজও হয় ত তাই হবে। আরও কতদিন এ ভাবে কাটাতে হবে তা জানি না। অমাবস্যার স্নান না ক'রে যে কেউ নড়বেন না, এ নোটিস আগেই পেয়েছি। তার পরেও কি খালি হবে?···আর খরচ—হে

ভগবান!…কী কুক্ষণেই এখানে বদলি হয়েছিলাম।

কিন্তু ভগবান বোধ করি স্থানে থেকেই কানে শুনলেন, সবে চেয়ারের ধুলো ঝেড়ে বসতে যাচ্ছি (আজকাল সব অফিসেই বোধ হয় এ কর্মটা নিজেদের ক'রে নিতে হয়!)—বেয়ারা এসে সেলাম ক'রে জানালে, ছোট সাহেব ডাকছেন।

ছোট সাহেব অর্থাৎ শাম্বমূর্তি। তাঁর আবার কী চাই ?

আরও বিরক্ত মুখে গিয়ে ঠেলা-দরজা খুলে তাঁর ঘরে ঢুকলুম।

'আমাকে ডেকেছেন ?'

শাম্বমূর্তি বসতে ইসারা ক'রে বললেন, 'মিঃ চৌধুরী, বড় বিপদে পড়েছি। আজই একজনকে মোরাদাবাদ যেতে হবে,—ওখানকার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জোয়ালাপ্রসাদের হার্ট য়্যাটাক্ হয়েছে, তাঁর ডেপুটি জোন্স্-এর মোটর য়্যাক্সিডেণ্টের খবর ত পরশুই পেয়েছি—এই মাত্র টেলিফোন এসেছে, নিজে থেকে চার্জ বুঝে নিতে পারে এমন একজন এফিসিয়েণ্ট লোক যাওয়া চাই—অন্তত যতদিন না জোয়ালাপ্রসাদ একটু সুস্থ হচ্ছে। দিল্লী থেকে চক্রবর্তীকে আনিয়ে নিতে পারি কিন্তু তারও স্ত্রীর অসুখ শুনেছি, এখনই কি আসতে পারবে ?'

কম্প্লিমেণ্টটা আমার প্রাপ্য বলেই মনে করি তবু বিনয় দেখিয়ে বললুম, 'আমি কি পারব ? বরং নটরাজন্‌কে—'

'না না'—প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে শাম্বমূর্তি, 'নটরাজনের কাজ নয়। আপনি যদি পারেন তাহ'লেই সবচেয়ে ভাল হয়। কিন্তু পারবেন কি ?'

পারব ? পা বাড়িয়ে বসে আছি! বলে কি লোকটা!

কোনমতে অন্তরের উল্লাস চেপে রেখে উদাসীন ভাবে বললুম, পারতেই হবে। অফিসের ইণ্টারেস্ট সবার আগে।'

শাস্বমূর্তি বললেন, 'অলরাইট্। আমি এখনই আপনার বার্থের ব্যবস্থা করছি। আজই বিকেলের গাড়িতে যেতে পারবেন ত ?'

'নিশ্চয়ই।'

বলা বাহুল্য, বাড়িতে ফিরে গৃহিণীর কাছে কথাটা পাড়তেই তিনি একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

'বাঃ, বেশত! খুব আক্কেল ত তোমার। আমাকে এই আতান্তরে ফেলে সরে পড়ছ! এমন স্বার্থপর তুমি ?'

'ঐ নাও! একি আমি সখ করে যাচ্ছি? অফিসের কাজ—সাহেবের হুকুম। না গেলেই চলবেনা। একজনের হার্ট য়্যাটাক্, আর একজনের য়্যাক্সিডেন্ট্—কী করব বলো। চাকরী ত আগে!'

'ঢের হয়েছে। এই চোদ্দ বছর ঘর করছি—তোমাকে আর আমি চিনিনি? পুরো ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে এই বোঝাটি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েঁ নিজে দিব্যি হাওয়া খেতে চলেছ! বেশত যাওনা—আমার কি, আমিও যেদিকে তুচোখ যায় সরে পড়ব।'

কিন্তু সে হোক্। তাঁকে আমিও এতকালে ঢের চিনেছি। ঘর-সংসার ফেলে 'যে-দিকে তুচোখ যায়' চলে যাবার মানুষ নন্ তিনি। তাছাড়া—'এ রোষ রবেনা চিরদিন!'

গম্ভীর মুখে অপটু হাতে বাক্স গোছাতে চেষ্টা করতেই তিনি আর থাকতে পারলেন না—বিনাবাক্যে বাক্সটা টেনে নিয়ে দরকারী জিনিস সব গুছিয়ে দিলেন। মায় শিশিতে ক'রে ঈষবগুলের ভূষি, সুপুরি মশলা কিছুই ভুল হ'ল না। লেপ তোষক টানাটানি ক'রে হোল্ড-অল্‌টাও গুছিয়ে বেঁধে দিলেন অর্থাৎ অর্ধেক সন্ধি তখনই হয়ে গেল। বাকি অর্ধেকটা হ'ল একেবারে যাত্রার সময়—আর থাকতে না পেরে অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে যখন বল্লেন, 'খুব সাবধানে থেকো। গাড়িতে না

ঠাণ্ডা লাগে। মাফ্‌লারটা ওভার কোটের পকেটেই রইল।'

সবে শান্তিতে চার পাঁচটা দিন মোরাদাবাদে কাটিয়েছি—বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত চিঠি এল—'তোমার শোবার ঘরটিও কাল খুলে দিতে হ'ল। তোমার বাঁকুড়ার কুটুম্বের দল এসে হাজির হলেন—এগারো জন। কোথায় জায়গা দিই বলো? সত্যিই ত আর পথ দেখিয়ে দিতে পারি না। একটা ঘর খালি থাক্‌তে—কীই বা বলি তাঁদের? যাইহোক্‌ তোমার বিছানাটা গুটিয়ে রেখেছি, যদি এর ভেতর ফিরে এসো ত সিঁড়ির চাতাল ভরসা, একটা লোকের মত বিছানা পড়তে পারবে। এখন সেখানে জগদেও আর শিউশরণ শুচ্ছে, ওরা অন্য কোথাও তখন মাথা গুঁজে থাকবে।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুসংবাদ বটে!

আমার কুটুম্ব মানে ওঁয়ার আত্মীয়! নিশ্চয়ই তাই—কারণ বাঁকুড়ায় আমার কোন আত্মীয় আছে বলে ত আমার জানা নেই। ওঁর আত্মীয় বলেই আমার শোবার-ঘর খুলে দিয়ে আমার জন্যে সিঁড়ির চাতাল ব্যবস্থা করতে হয়েছে! মেয়ে-মানুষ জাতটাই এমনি বটে! বাপের বাড়ির লোক এল ত, ব্যস! মাথা খারাপ হয়ে গেল। ছোঃ! ঐ একটা ঘরও বাঁচিয়ে রাখা গেল না? টাকার ব্যবস্থা করবার সময় শুধু আমি—বাড়িতে বা সংসারে আর আমার কোন অধিকার নেই!

চিঠির শেষে আরও একটি খোস্‌খবর ছিল—'তোমার দেওয়া টাকা ফুরিয়ে প্রায় দেড়শ টাকা ধার হয়ে গিয়েছিল—কাল আমার নামে যে কটি টাকা ছিল পোস্ট অফিসে সব তুলেছি। কিন্তু তাতেও ত কুলোচ্ছে না। তুমি কবে নাগাদ ফিরতে পারবে? যদি পয়লার

মধ্যে না ফেরো ত অফিসে চিঠি লিখে দিও, পয়লা তারিখেই যেন মাইনের টাকাটা আমাকে পাঠিয়ে দেয়!'

তা দেব বৈকি! তার কম আর নেশা জমবে কেন! সারা মাসের মাইনেটি উনি দয়া ক'রে পাঁচ দিনে খরচ করবেন, তারপর মর্ শা—তুই!

সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল চিঠিখানা পড়ে। এমনিই অদৃষ্ট বটে। কোথায় এই কঠোর বিরহ-দশায় কান্তার প্রণয়-লিপি পড়ে প্রাণ জুড়িয়ে যাবার কথা, না আমার সারা দেহে-মনে কে যেন আরও বেশী ক'রে বিষ ছড়িয়ে দিলে!

থাকুন তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন নিয়ে সুখে—যেখান থেকে পারেন খাওয়ান। আমি ওর মধ্যে নেই।···ফিরবও না—টাকাও পাঠাব না। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করলুম।

কিন্তু আসল লড়াইটা যে আমার ভাগ্যের সঙ্গে সেটাই ভুলে গিয়েছিলুম। চরম মারটা এল একত্রিশে জানুয়ারী—জোয়ালাপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে অফিসে দেখা দিলেন এবং হেসে বললেন, 'যান আপনি, আপনাকে আর অনর্থক আটকাবো না। এই যোগের সময় বাড়ি ঘর ফেলে এসেছেন—আপনার যা মনের অবস্থা বুঝতে পারছি ত!'

আনন্দে বোধ করি আমার মুখ কালিই হয়ে গিয়েছিল। কণ্ঠে যথেষ্ট উদ্বেগ এনে বললুম, 'কিন্তু আপনি এত তাড়াতাড়ি করলেন কেন? যদি আবার রিল্যাপ্স্ করে?'

'না না—সে ভয় নেই। খুব সিরিয়াস্ কিছু ত হয়নি। ডাক্তার প্রথমটা অকারণেই ভয় পেয়েছিল। তাছাড়া আমি খুব সাবধানেই আছি। আর জোন্স্ও হাসপাতাল থেকে পরশু ছাড়া পেয়েছে—

দু-একদিনের মধ্যেই জয়েন করবে। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যান।'

শুধু তাই নয়, ট্রেণে ফেরার অসুবিধা হবে বলে তিনি এয়ার প্যাসেজ বুক করিয়ে দিলেন। আমি যে তাঁর অসুখের খবর পাওয়ামাত্র ছুটে এসেছিলুম, এর জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

পয়লা ফিরলুম। পথ-ঘাট প্রায় বন্ধ—গাড়ি-ঘোড়া এমন ঘুরিয়ে দেবার ব্যবস্থা যে কুড়ি মিনিটের পথ পৌঁছতে পৌণে দু ঘণ্টা লাগল। বিরক্তির অন্ত নেই। মন ত যথেষ্টই বিরূপ হয়ে ছিল এখানে এসে ভীড়ের ব্যাপার দেখে আরও বেশী বিরূপ হয়ে উঠল। বাড়ির দোরে নেমে মনে হ'ল এ কার বাড়িতে এলুম? আমার সাধের ফুলগাছগুলি নিশ্চিহ্ন—তার উপরে খড় বিছিয়ে আর চট্ টাঙ্গিয়ে ডেরা-ডাণ্ডা পড়েছে। কতক লোককে চিনি, কতককে কখনও দেখেছি এর আগে বলে মনে পড়ল না।

সবচেয়ে—গৃহিণীর টিকিও দেখতে পেলুম না। রিক্সা থেকে নেমে 'জগদেও' 'জগদেও' ক'রে হেঁকে হেঁকে গলা প্রায় যখন ফাটিয়ে ফেলার উপক্রম করেছি তখন হঠাৎ কোথা থেকে তিনি একবার সেই জনারণ্যে আবির্ভূতা হ'লেন—চকিতের জন্যে। 'ও, তুমি এসেছ—বাঁচলুম। একটা পয়সা হাতে নেই—সুরযপ্রসাদ ধার দিচ্ছে তাই—নইলে কী যে করতুম!...একেবারে সিধে ছাদে চলে যাও, সিঁড়িতে একটা ছোট্ট ক্যাম্প-খাট পেতে তোমার বিছানা ক'রে দেবে এখন জগদেও। তোমার বাক্সটাও সেই খাটের নিচে রাখবে, বুঝলে? স্নানের জল-টল সব ছাদেই পৌঁছে দেবে—এ যা অবস্থা হয়েছে, সাক্ষাৎ নরককুণ্ডু, নিচে আর তুমি কোথাও যাবার চেষ্টা ক'রো না।'

ব্যস! পরমুহূর্তেই তিনি অদৃশ্য।

ছেলেমেয়ে দুটোকেও দেখতে পেলুম না। কোথায় গেছে কে

জানে। তাদের দিকে কী আর নজর দেবার সময় আছে তাদের মায়ের ?

যাই হোক্—অতি কষ্টে ত জগদেও এসে উদ্ধার ক'রে নিয়ে গেল সিঁড়ির চাতালে। আগেকার প্রশস্ত সিঁড়ি, কাজেই চাতালটিও লম্বা-চওড়া। একটি ছোট্ট মিলিটারী ক্যাম্প-খাট বেশ ধরে। মনে প'ড়ে গেল এটি যুদ্ধের পর ডিস্‌পোজাল থেকে কিনেছিলাম। আমার অবশ্য মনে ছিল না—গৃহিণী কিন্তু খুঁজে বার করেছেন ঠিক। নিজেদের বাপের বাড়ির স্বার্থে মেয়েদের মাথা অসম্ভব খুলে যায় !

স্ত্রী যদিও নিচে নামতে বারণ করেছিলেন তবু স্নানাদি সেরে একবার নামলুম। যা বর্ষা নেমেছে—ছাদের সিঁড়ি স্থানটিও খুব আরামদায়ক নয়। এই শীতে বর্ষা, সমস্ত মন খিঁচ্‌ড়ে দেবার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট।

নামবার উদ্দেশ্য অবশ্য আর একটাও ছিল। আমাকে স্থানচ্যুত ক'রে গৃহিণী তাঁর যে সব আত্মীয়দের ঢুকিয়েছেন তাঁরা কেমন সেটাও দেখা প্রয়োজন। কিন্তু ভীড় ঠেলে এসে দোরের কাছ থেকে উঁকি মেরে যা দেখলুম তাতে মনে হ'ল গুরুজনের নির্দেশটা অমান্য করা ঠিক হয় নি—নিচে না নামাই উচিত ছিল। ডিস্‌টেম্পার করা দেওয়াল পানের পিচে ও শীতকালীন কফে ইতিমধ্যেই বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, নতুন ড্রেসিং টেবিলে চুণ মোছার চিহ্ন, আমার কাজ করার ছোট সেক্রেটারি-য়াট টেবিলটায় ভিজে জামা ও কাঁথা শুকোচ্ছে। ভাল ভাল দামী আসবাব লণ্ডভণ্ড—কাগজপত্রের যা অবস্থা হয়েছে তা ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখতেও পারলুম না—একবার সেদিকে চেয়েই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল তাদের পরিণাম আশঙ্কা ক'রে।

নিঃশব্দেই সরে আসছিলুম কিন্তু সে দলের যিনি কর্তা—বেঁটে-খাটো টাক-মাথা ভদ্রলোকটি, মেঝেতে আমারই কার্পেটখানি পেতে

বসে তামাক খাচ্ছিলেন—হঠাৎ আমাকে দেখে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স-কলরবে অভ্যর্থনা জানালেন, 'এই যে বাবাজী এসো এসো—উঁহু, অমন করে পালিয়ে গেলে চলবে না। বসো—অবিশ্যি কোথায়ই বা বসবে—তা হোক। আমরা তো তোমার পর না, বিশেষ আপন যে। তোমায় দেখেই চিনেছি। তুমিই আমাদের অরুণ বাবাজী ত? ছ্যাখো এমনিই অন্তরের টান। চোখে কখনও দেখিনি কিন্তু তাতে কি চেনা আটকায়? বাবাজী, দেখাশোনা নেই তাই। সম্পর্কটা খুবই কাছাকাছি। তোমার শ্বশুর মশাই আমার পিসিমার আপন দেওরপো। বুঝলে এবার?'

বুঝলুম না—বোঝবার চেষ্টা করবার মত মনের অবস্থাও নয়। বিয়ের সময় থেকে আজ পর্যন্ত কোন জ্যাঠ্‌শ্বাশুড়ীর খবর শুনেছি বলে মনে পড়ল না। কিন্তু সেই ভীড়ে গোলমালে ও মানসিক অবস্থায় তলিয়ে বোঝবার মত উদ্যমই বা কোথায়? শুধু এইটুকুই মনে হ'ল যে এঁদের বাড়ি বাঁকুড়ায় লিখেছিলেন গৃহিণী কিন্তু সে রকম টান ত কোথাও খুঁজে পেলুম না। মরুক্ গে, তাঁর আত্মীয় তিনি বুঝবেন।

কোনমতে মুখের কাষ্ঠহাসি বজায় রেখে একটা ছুটো প্রণাম সেরে আবার নিজের কোটরে ফিরে এলুম···

পরের দিন সকালে উঠেই অফিসে পালালুম কিন্তু তবু এর ভেতরেই একটা জিনিস নজর এড়াল না যে গৃহিণীর এই বিশেষ আত্মীয়দের জন্য আহারাদিরও যেন একটু বিশেষ ব্যবস্থা হচ্ছে। আমাদের ত সেই সনাতন হালুয়া নামধারী পুলটিশ বরাদ্দ কিন্তু ওঁদের ঘরে যে জল-খাবার গেল তার সঙ্গে দেখলুম কিছু পেঁড়াও আছে। আবার জগদেওর মুখে শুনলুম যে ওঁরা মাছ ছাড়া খেতে পারেন না বলে আর কারুর জন্য না হোক্—ওঁদের জন্য এই ছুর্দিনেও মাছ আনানো হচ্ছে,

বহু দুঃখে, বহু আয়াসে।

তা হবে বৈকি !

হালুয়ার থালা স্পর্শ করতেও প্রবৃত্তি হল না। কোনমতে চা-টুকু গলাধঃকরণ করে বেরিয়ে পড়লুম। যদিও পরে রাস্তায় এসে অনুতাপ হ'তে লাগল—গৃহিণী ত ত্রিসীমানাতেও ছিলেন না, কাল থেকে পরমব্রহ্মের মতই দুর্লভ হয়ে রয়েছেন, রাগটা দেখতেও পেলেন না,—মিছিমিছি আমিই খালি পেটে বেরুলাম। সারাদিনে আর কিছু হয়ত জুটবেও না।

গৃহিণীর সঙ্গে নিরিবিলি দেখা হ'ল একেবারে পরের দিন ন-টা নাগাদ। তখন সবাই স্নানে চলে গেছেন, বাড়ি খালি। শুধু আছে ক্লান্ত ঝি চাকর, আমার ছেলেমেয়ে এবং আমরা দুটি প্রাণী।

রাত্রি জাগরণে আরক্ত চক্ষু, পরিশ্রমে শীর্ণা প্রেয়সীকে দেখে দুঃখ হবারি কথা কিন্তু আমার উষ্মা শতগুণে বেড়েই গেল। সেদিন অফিস বন্ধ, সুতরাং পালানোরও কোন সুবিধা নেই—এই স্যাঁৎসেতে ঠাণ্ডা, নিরানন্দময়, নরকসদৃশ বাড়িতেই আটক থাকতে হবে—উপায় কি !

গৃহিণী বিনা ভূমিকাতেই বললেন, 'হ্যাঁ গা—আমরা চান করতে যাবো না ?'

গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলুম, 'তোমার খুশী হয় যেতে পারো। চাকর বাকরদের যদি সময় হয় ত দয়া করে একটু গরম জল দিতে বলো—আমি বাড়িতেই স্নান সারব।'

'তা ত বলবেই। আমি খালি তোমার বাড়িতে বাঁদীগিরি করতেই এসেছিলুম না ? ক-দিনে হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেল বাবা। ওঁরা এসে চান করে পুণ্যি সঞ্চয় করে যাবেন তার জন্যে আমি ধনে প্রাণে ম'লুম অথচ এখানে থেকেও আমার একটা ডুব হবে না ! বেশ, তোমার যা

ভাল বিবেচনা হয় তাই করো। আমার আবার বার তিথি, আমার আবার দিন ক্ষণ!'

'তোমার যে আত্মীয়দের সেবা করছ এত ক'রে, তাঁদের পুণ্য হচ্ছে ত! তাতেই তোমারও কিছু হয়ে যাবে। পুণ্যবানের সেবা করলেও পুণ্য হয়।'

আমার কণ্ঠে বিদ্রূপের সঙ্গে যে কিছু জ্বালাও ছিল সেটা আমিও স্বীকার করি। তবে তাতে উপকারও হ'ল বৈকি! কোথায় গেল গৃহিণীর শ্রান্তি আর কোথায় গেল অবসন্নতা। তিনি ফোঁস ক'রে রুখে উঠলেন, 'আমার কিসের আত্মীয়? চোদ্দ পুরুষের আত্মীয় আমার! আমার কে এসেছে তাই শুনি? এক ত দাদার শাশুড়ীরা তিনটি প্রাণী, তা তাঁদের ত ঘরে ঠাঁই দিতে পারিনি—এই শীতে বর্ষায় বাগানে পড়ে রয়েছেন। বলি কী দরকার বাবা—যার বাড়ি যে খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে, তারই আত্মীয়দের ক্লেম আগে। আর সইমা—? তা 'সে, ত' তোমাদেরও দূর সম্পর্কে আত্মীয় হয় বাবা!...আমার আর কে আছে তাই শুনি? তোমারই ত' সাতগুষ্টি!'

'বটে'! এই ক'দিনের সমস্ত বিষ গল্‌গল্‌ ক'রে বেরিয়ে এল, 'আর ঐ যাঁদের জন্যে আমার ঘরখানি খুলে দিয়েছ—জামাই-আদরে রাজ-আদরে কদিন ধরে বসিয়ে খাওয়াচ্ছ—তাঁরা?'

'অ! ওঁরা আমার আত্মীয়? তাই আদরে খাওয়াচ্ছি? আমার কোন চোদ্দ পুরুষের লাউখোলা সেটা শুনি? জেনে রাখি।...তোমার নিকট আত্মীয়, পাছে পরে তোমার বদনাম হয় সেই জন্যেই আমার অত করা। নইলে আমার কি স্বার্থ। আমি বুঝি আমার আত্মীয়দের জন্যে ঘর খুলে দিয়ে তোমাকে বার ক'রে দিয়েছি। বেশ বিচার বটে। বাঃ!'......ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তাঁর কণ্ঠ।

কী রকম হ'ল ?

সোজা হয়ে উঠে বসি। বলি, আমার কিসের আত্মীয় ? ঐ বুড়োটা তোমার—কে যেন—হ্যাঁ মনে পড়েছে, তোমার বাবার জ্যাঠাইমার ভাইপো হয় না ?'

'তোমার বাবার জ্যাঠাইমার ভাইপো হয়—আমার কে ?'

'সে কি। কাল আমাকে স্পষ্ট বললেন ভদ্রলোক, ওঁর পিসিমার সাক্ষাৎ দেওর-পো ছিলেন আমার শ্বশুরমশাই !'

'পোড়া-কপাল আমার বাবার ! ঐ রকম আত্মীয় ? আর হ'লেও আমি ঝাঁটা মেরে বিদেয় করতুম। তোমার আপনার লোক বলেই দাঁতে দাঁত দিয়ে সহ্য করছি !'

'রোস-রোস। ব্যাপারটা কি বলো দিকি ? তুমি ওঁদের চেন না ?'

'সাত জন্মে কখনও দেখিনি, তা চিনব কি ?'

'সে কি ?...তবে অমনি অচেনা লোককে ঘর খুলে দিলে ?'

'তা আমি কি জানি। এসে তোমার নাম ক'রে বললে, অমুক কোথায় ? আমার চিঠি পায়নি ? কী সর্বনাশ !...এখন জায়গা নেই বললে আমরা কী করব। আমাদের তাহ'লে আগে লেখা উচিত ছিল। সে কী রাগারাগি। তারপর আমাকে ডেকে বললে, বৌমা আমরা ওর পর না—খুবই আপন। আমার পিসিমার নিজের দেওর-পো ছিলেন তোমার শ্বশুরমশাই। ওর ঘরটাই খুলে ছাও—সে কিছু মনে করবে না !'

'তা আমার ঘর যে চাবি দেওয়া আছে তাই বা বলতে গিছলে কেন সাত-তাড়াতাড়ি ?'

'আমি বলতে যাবো কেন ? তার আগেই গিয়ে ঘুরে দেখে তালা টেনে শিউশরণকে জিজ্ঞাসা করা হয়ে গেছে।'

'কী সর্বনাশ। এ যে জালিয়াতি!' কী বিশেষণে এ আচরণকে অভিহিত করব তা ভেবে পেলাম না। জালিয়াতি শব্দটাই আগে মনে এল।

এক মুহূর্তে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্ধি হয়ে গেল। তখনই আবার কাউন্সিল অব্ য়্যাকশন্ বসানো গেল।...এখন কি কর্তব্য?

আমি বলুম, 'ফিরুক সঙ্গম থেকে। যাচ্ছেতাই অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেব!'

গিন্নী চিন্তিত মুখে বললেন, 'কিন্তু ছাখো সে আর একটা কেলেঙ্কার! সব জানাজানি হয়ে যাবে—হাসাহাসি করবে সবাই। আমাদেরই বোকা বলবে—এ অবস্থায় হয়ত সকলেই এমনি বোকা বনত কিন্তু এখন ত চোরের দায়ে ধরা পড়ব আমরা। তা'ছাড়া চান ত হয়েই গেল—এখন আর একদিন ছ'দিনের জন্য গোলমাল ক'রে লাভ কি? এবার যাবেই ত—আজ নয় কাল!'

'আমরা' নয়—উনিই বোকা বনবেন—এই ওঁর ভয়। কিন্তু এতদিন পরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ঐক্যতান বেজেছে তাকে আর নষ্ট করতে চাইলাম না সত্য কথা বলে। তার চেয়ে কিল খেয়ে কিল চুরি করা ঢের সহজ।

সুতরাং চিরকাল সব স্বামী যা ক'রে এসেছেন আমিও তাই করলাম—তাঁর মতেই সম্মত হলাম।

স্নান সেরে দেড়টা-ছটো নাগাদ একে একে সবাই ফিরতে সুরু করলেন।

বাগানে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা আহারাদি সেরে স্টেশনের দিকে

যাবেন এই ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। সম্বন্ধীর শ্বশুর বাড়ি থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে দুটি বিধবা—দুজনেরই অমাবস্যার উপবাস। কর্তব্যবোধে একবার তবু স্মরণ করাতে গেলাম কথাটা—'কাল বরং দুটি ভাত মুখে দিয়ে গেলেই ত হ'ত। কতদিনে পৌঁছবেন তার ঠিক কি! আপনারা ত আবার গাড়িতে খাবেন না!'

সম্বন্ধীর শাশুড়ী যিনি, গৃহিণীর মাউই-মা—তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'না বাবা—কাল থেকে ভিড় আরও বাড়বে। খুব শিক্ষা হয়েছে কুম্ভে চান করতে এসে, শরীর গেল, মালপত্র অপ্‌চ—এখন ভালয় ভালয় গুরুর কৃপায় ফিরতে পারলে বাঁচি। আর মেয়েটারও যা হাল হচ্ছে —ভিড় কাটিয়ে না দিলে ও একটা শক্ত অসুখে পড়বে।'

মেয়েটা অর্থাৎ আমার স্ত্রী। কৃতজ্ঞ-চিত্তে চুপ ক'রে রইলাম। গৃহিণীও তাড়াতাড়ি খানিকটা পানফলের আটার হালুয়া ক'রে মিস্টি আনিয়ে ওঁদের খাইয়ে দিলেন। যত ঝামেলা কমে।

যাঁরা ঘরে ছিলেন অর্থাৎ প্রথম স্নানের পূর্ব থেকে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে একদল শ্রীপঞ্চমীর পরে যাবেন আগে থেকেই ঘোষণা ক'রে রেখেছিলেন, বাকি যাঁরা তাঁদের মধ্যেও ছোট একদল আহারাদির পরই স্টেশন রওনা হয়ে গেলেন। যখন যে ট্রেণ পান—তাঁরা স্টেশনেই অপেক্ষা করবেন। বাকি আর এক দলের মুরুব্বী যিনি তিনি আমার সাইকেলখানা সংগ্রহ ক'রে স্টেশনে গেলেন। উদ্দেশ্য যাওয়ার সুযোগ-সুবিধা খোঁজ করা। এখনই না গেলেও শিগ্‌গিরই যে যাবেন—সে আশ্বাস প্রকারান্তরে দিয়ে দিলেন।

শুধু দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোন ব্যতিক্রম দেখলাম না সেই বাঁকুড়ার আত্মীয়দের। একেবারে দেখলাম না তাও বলা যায় না— একটু যেন বিরক্তই। গৃহিণীর কাছে শুনলুম—সঙ্গমে যাওয়ার গাড়ি

ঘোড়া ব্যবস্থা ক'রে দিইনি বলেই তাঁদের এই বিরক্তি। সকালে একটু রাগই করেছিলেন।

কিন্তু যাওয়া? না—সে রকম কোন কথাই তোলেন নি।

অগত্যা গুটি গুটি নেমে এসে নিজের ঘরের সামনেই অবাঞ্ছিত অতিথির মত সসঙ্কোচে দাঁড়াতে হ'ল। সেই ভদ্রলোক তেমনি প্রশান্ত মুখেই তামাক টানছেন বসে। আহারাদি বোধ করি ভালই হয়েছে—নিরতিশয় তৃপ্তির ছাপ।

'এই যে বাবাজী এসো। আহারাদি হয়েছে?' সৌজন্যের কোন অভাব এ পক্ষে অন্তত নেই।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' তারপর মরীয়া হয়েই বলে ফেলি, 'আপনাদের ত বোধহয় আজ যাওয়াই সুবিধা। কাল থেকে ত আরও ভিড় বাড়বে।'

'আজ?...তুমি ক্ষেপেছ বাবাজী! সে স্টেশন ত শুনছি লোকে লোকারণ্য—সকাল থেকেই অনেকে জম্‌ছে। তোমার মত চালাকের ত অভাব নেই।...হেঁ হেঁ...। না—এখন দশ-বারোদিন আর ও চেষ্টাই করব না। আর আমাদেরও তেমন তাড়া নেই। এলাহাবাদ শহরটা ত ভাল ক'রে দেখাই গেল না ভিড়ের চোটে। একটু ঘুরে-ফিরে দেখি—সে হবে খ'ন—তোমাকে ব্যস্ত হ'তে হবেনা। বরং ওঁরা সরে পড়লে আমরা ঐ ঘরটায় চলে যাবো—একটু হাত-পা মেলে থাকা যাবে। তুমিও তোমার ঘরে ফিরে আসতে পারবে।...ওঁরা কি যাবেন? মাস খানেক ধরে যে পরের ঘাড়ে বসে রয়েছেন—সে বিবেচনা আছে!'

আবারও তেমনি নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে হুঁকোয় টান দিতে সুরু করলেন।

অনাবশ্যক

কেষ্টর মা যে কোনোদিন সমস্যা হয়ে উঠবে তা এতকাল কেউ কল্পনাও করেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই ত হ'ল!

বোসেদের বর্তমান যাঁরা কর্তা, এঁদের পিতামহ রায় সাহেব অনুকূল বোস যখন এই বাড়িটি প্রথম করেন তখন থেকেই কেষ্টর মা এখানে আছে। অনুকূলবাবুর স্ত্রীর বাপের বাড়ি ধাত্রীগ্রামে। কেষ্টর মারও বাপের বাড়ি। তাঁর বাপের বাড়িতেই কেষ্টর মার মা—অর্থাৎ কেষ্টর দিদিমা কাজ করত। সেই সুবাদেই জানা-শুনো। কেষ্টর মার নামটাই কিন্তু সব—অর্থাৎ কেষ্ট বা বলরাম, কোন ছেলেই কখনও ওর হয়নি। কেষ্টর মা যখন প্রথম এ বাড়িতে কাজ করতে আসে তখন অনুকূল-বাবুর স্ত্রী সুবালা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কী বলে তোকে ডাকব রে? তোর নাম কি?'

তখন বিষম বিব্রত হয়ে পড়েছিল সে।

'ওমা, নাম? মায়ের যা কাণ্ড!—এক নাম যা রেখেছে তা' ত বলবার উপায় নেই। আবার নিজে ডাকে 'খুকী' বলে—সেই-বা লোকে কী মনে করবে? তা তোমরাই যা হয় একটা ঠিক ক'রে দাও না বাপু!'

'সে কী রে!' সুবালা অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোর নাম আমরা ঠিক ক'রে দেব। কেন, তোর নামটা কি তাই শুনি না।'

'সে কথা আর ব'লো না। মা নাম রেখেছিল চারু।'

'বেশ ত, চারু বলেই ডাকব না হয়।'

'না না—বাপু, সে আমার বড্ড লজ্জা করবে। তার চেয়ে তোমরা বরং কারুর মা বলেই ডেকো।'

'না বিইয়ে কানাইয়ের মা!' সুবালা হেসে বলেছিলেন, 'তা মন্দ নয়, তোকে আমরা কেষ্টর মা বলে ডাকব।'

তখন ঝিকে নাম ধরে ডাকার রেওয়াজ ছিল না, ছেলে বা মেয়ের পরিচয়েই লোকে ডাকত। সুতরাং এই ব্যবস্থাই সকলের কাছে সহজ বলে মনে হ'ল।

সেই থেকেই কেষ্টর মা এ বাড়িতে আছে।

আর কখনও দেশে যাবার দরকার হয়নি—একবার ছাড়া। সে শুধু যেবার ওর মা মারা যায়। গিয়ে যা কিছু ছিল বেচে-কিনে শ্রাদ্ধশান্তি করে চলে এসেছিল। ওর তিনকুলে কেউ ছিল না—থাকলেও কেষ্টর মা তাদের কখনও আমল দেয়নি। ছেলেপুলে ওর হয়নি—হবার সুযোগও মেলেনি। দু'বার বিয়ে হয়েছিল ওর। প্রথম বিয়ে হয়—তখন ওর সাত বছর বয়স। মাস কতকের ভেতরই কলেরায় ওর সে বর, শ্বশুর, দেওর সব শেষ হয়ে যায়। তারপর দশ বছর বয়সের সময় আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখে ওর মা। বৈষ্ণবমতে কণ্ঠিবদল হয় আর একটি ছেলের সঙ্গে—কিন্তু সেও ওর কপালে টিক্‌ল না। মাঠে কাজ করতে গিয়ে সাপে কাট্‌ল তাকে। তখন ওর সবে বারো পূর্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয় বারও শাঁখা-রুলি খুলে বাপের বাড়িতেই এসে উঠতে হ'ল। মা তাতে অসুবিধা বোধ করেনি তত। মায়েবেটিতে মিলে কাজে যেত—তিন বাড়ির কাজ সকালে এক প'র বেলার মধ্যেই সেরে ফেলত। মেয়েকে চোখের আড়াল করতে দেবে না ব'লে—যে ক' বাড়ি কাজ করত, একসঙ্গেই যেত হাতাপিতি ক'রে একসঙ্গেই সারত। কিন্তু বছর কতক পরে দেখা গেল যে তাতেও নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না।

কেষ্টর মা নামের উপযুক্ত রকম ভাবেই কৃষ্ণবর্ণ ছিল—তবু তারও প্রণয়প্রার্থীর অভাব হ'ল না। আঠারো উনিশ বছর বয়সের একটা মোহ আছে—কেষ্টর মাও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল একটু। এই সময়ই তার মার কানে খবরটা পৌঁছল রায়েদের মেয়ে সুবালার বর খুব বড় চাকরী করছে আজকাল, দিল্লী থেকে বদলী হয়ে কলকাতায় এসেছে, বাড়িও করেছে নিজে। ঠিকানাটা রায়েদের বাড়ি থেকেই যোগাড় হয়ে গেল। তারপর সে একদিন মেয়েকে সঙ্গে ক'রে এসে সুবালার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল, 'এই তোমার কাছে গচ্ছিৎ ক'রে দিয়ে গেলুম, মেজদিমণি, মারো কাটো, ফাঁসি দাও যা করো করো—বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিওনা কোনদিন। খাবে-দাবে থাকবে—আজ থেকে ও তোমাদেরই মেয়ে। আমি আর ক'দিন বলো ?'

মেয়েকেও শাসন ক'রে গেল, 'খবরদার, এ বাড়ির চৌকাঠ কোন-দিন ডিঙ্গুবিনি।'

তারপর দীর্ঘকাল কেটে গেছে।

সুবালা গেছে, অনুকূলবাবু গেছেন। অনুকূলবাবুর তিন ছেলের ভেতর একজন ছেলেবেলাতেই গিয়েছিল—দু'জন কেষ্টের মার চোখের সামনেই বড় হয়েছে, চাকরী পেয়েছে বিয়ে-থা করেছে। তাদের ছেলেপুলেতে বাড়ি ভরে গেছে। তারা বড় হয়েছে, বিয়ে-থা করেছে। তাদেরও ছেলেপুলে হয়েছে। অনুকূলবাবুর ছেলে-দুটির একজনও নেই। এমন কি তাঁদের স্ত্রী-রাও গত হয়েছেন। তাঁদের ছেলেরাই আজ পরিণতবয়স্ক।

অর্থাৎ বহু বৎসর কেটে গেছে কেষ্টর মারও জীবনে।

কিন্তু সে হিসেব সে রাখে না।

কত বয়স তার ?...ষাট সত্তর, আশি ? একশ' ?

'কে জানে ! কত বছর। আমি কি ছাই অত হিসেব রেখেছি! তবে সে অনেকদিন। এই দ্যাখো না, তখন মেজো মেসোমশায় বেঁচে, চাকরী করছেন। সে কতকাল হ'ল গা ?—'

এইভাবেই হিসাব গুলিয়ে যায়।

এতকাল কেষ্টর মা একা এই বাড়ির সব কাজ করেছে। ধোয়া-মোছা, বাসনমাজা, বাটনাবাটা, জলতোলা, মায় ছেলেমেয়ে দেখা পর্যন্ত! চাকর শুধু বাইরের ফায়-ফরমাশ খাটত আর বাজার করত। কেষ্টর মা কোনদিন কোন কারণেই একা বাড়ির বাইরে বেরুত না। এ বিষয়ে সে মার অনুশাসন মেনে চলত অক্ষরে অক্ষরে। গ্রহণে স্নান করতে বা কালীঘাট যাবার সময় গৃহিণীরা কেউ সঙ্গে নিয়ে গেলে তবে যেত। কিন্তু সে পাটও উঠে গেছে আজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর। এখন-কার যাঁরা গৃহিণী ওসব ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহ কম—তাছাড়া গেলেও কে ঐ চরচরে অনাত্মীয় বুড়িকে টেনে নিয়ে যাবে ?

কেষ্টর মা কখনও মাইনে পায়নি এ বাড়ি থেকে। সুবালা যতদিন বেঁচেছিলেন তিনি বলতেন, 'তোর সব খরচ ত আমরাই দিচ্ছি, মাইনে নিয়ে তুই করবিই বা কি ? বরং যদি কখনও তীর্থধর্ম্ম করতে ইচ্ছে হয় ত বলিস—সেই সময় কিছু টাকা দেব।'

কর্তার কাছে বলতেন, 'আমরা ত ঝি রাখতে যাইনি—ওর মা-ই গছিয়ে দিয়ে গেছে। মাইনে দেবার অত গরজ কি আমাদের ?...যদি কোনদিন চোখ-কান ফোটে, চায় ত দেখা যাবে!'

সে চোখ-কান কেষ্টর মার কোনদিনই ফোটেনি। তার বহু আগেই সুবালা চোখ বুজেছেন! ছেলেরাও—খাতায় কোন খরচা লেখা ছিল

না ব'লে ও প্রসঙ্গ তোলেনি। মাইনের কথা ওঠেইনি কোনদিন।

খায়—কাপড় ছিঁড়লে কোন ব্যক্তি-বিশেষকে না শুনিয়ে সাধারণ-ভাবেই চেঁচিয়ে বলে, 'ছু'খানা কাপড়ই ন্যাতাকানি হয়ে গেল বাবুরা, বুড়ির একটা কাপড় চাই।' খরচের ভেতর একটু আফিং খাওয়ার অভ্যাস আছে। সেটা এঁরা দিতে খুব আপত্তি করেন না—বাজার-বেলায় বাজারের খরচ থেকেই সেটা এসে যায়।

আলাদা কোন টাকার দরকার আছে, কেষ্টর মাও কোনদিন ভাবেনি। এমন কি বিয়ে-থা শুভকর্মে বাড়ির অন্য ঝি-চাকর যখন বকৃশিশ আদায় করত—কেষ্টর মা তখন কোনদিন কিছু চায়নি। সে নিজেকে এ বাড়ির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই ভাবত ঝি বলে কখনও ভাবেনি। সে আশা করতো যে এরাও তাই ভাবে।

• কিন্তু সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে। বেশিদিন বাঁচারও একটা সীমা থাকা দরকার। কেষ্টর মা সে সীমা লঙ্ঘন ক'রে গেছে। তাকে দিয়ে কোন কাজই হয়না। একেবারে অথর্ব হয়ে, বেঁকে পড়েছে। অথচ ছু'বেলা খাওয়া পরা, আফিং—সব খরচই আছে। সিঁড়ির নিচের ফালি ঘরটাও সে দখল ক'রে থাকে। আগে সে ওপরেই শুত ছেলেমেয়েদের ঘরে—ক্রমে ঘরের অভাব হওয়ায় এসে ঐখানে আশ্রয় নিয়েছিল। তাকে সেখান থেকে নড়ানো যায় না। অথচ অন্য ঝি-চাকরদেরও থাকার কষ্ট। তাছাড়া বড্ড খিটখিট করে ঝিয়েদের সঙ্গে। যেন ঐ-ই গিন্নী। বললেও শোনে না। পাগল ব'লে, ভীমরতি ব'লে তারা তবু ক্ষমা করে কিন্তু তাই বা কত সহ্য করবে তারা?

তবু সমস্যাটা এতকাল খুব প্রকট হয়ে ওঠেনি একান্নবর্তী সংসার ছিল বলে।

দোতালা বাড়িকে তেতালা করলেও ঘর তিনখানার বেশী বাড়ানো যায়নি। এদিকে ছেলেপুলে নিয়ে মোট অধিবাসীর সংখ্যা বর্তমানে ছাপ্পান্নটি। কিছুতেই, কোনমতেই এই স্থানে কুলোবার কথা নয়। বিশেষত এগারোটি যেখানে দম্পতি!

তাছাড়া বনিবনাও হচ্ছে না দীর্ঘকাল থেকে। টাকাকড়ি কে কত দেবে—এ নিয়ে প্রতিমাসেই শেষের দিকে কলহ। সকলেই তখন পৃথক হ'তে ব্যগ্র। এ বাড়ি ভাগ ক'রে থাকা সম্ভব নয়। প্রথমত দুটো ভাগ হবে, সেই অর্ধেক দুটির একটি হবে চার ভাগ, একটি পাঁচ ভাগ। শেষ ভাগে একটা ক'রে ঘরও পড়বে না। কী হবে ভাগ ক'রে?

সেজবাবু শ্বশুরের বিষয় পেয়েছেন, নগদ টাকাটা পেলেই তিনি সরে পড়েন। মেজবাবুরা বেহালা অঞ্চলে জমি কিনেছেন অনেকদিন ভাগের টাকাটা হাতে পেলে বাড়িতে হাত দিতে পারেন। বড়বাবুর দুটি যমজ মেয়েই বিবাহযোগ্যা—তাঁর ও একখানা ঘরের ভাগে কুলোবেও না—তাছাড়া বাড়ি মাথায় থাক্, মেয়েদের বিয়ে আগে। এমনি প্রত্যেকেরই ঝোঁক বাড়ি বেচার দিকে। এক ছোট কর্তা নিতে পারতেন সব বাড়িটাই, যুদ্ধের বাজারে দু'পয়সা করেছেন কিন্তু তিনিও তাতে রাজী নন্। বলেন যে, আমি যত দামই দিই না কেন ওরা মনে ভাববে আপনার লোক বলে ঠকালে। আর মুখে বলবে যে, তা যাক্‌গে —তবু ত নিজেদের মধ্যেই রইল। তারপর হয়ত তখন আর বাড়ি ছাড়বার তাগাদা থাকবে না। যাক্—তার চেয়ে সোজাসুজি পরেই যাক্।

সুতরাং—

কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দালাল লাগিয়ে একদা বাড়িটি বিক্রী করে

দেওয়া হ'ল। সাড়ে বাহান্ন হাজার টাকা দর উঠল—হয়ত আরও বেশি ওঠা উচিত ছিল কিন্তু বাবুদের ধৈর্যের অভাব।

এইবার সাজ সাজ রব উঠল।

বাড়ি ভাড়া করে রেখেছিলেন কেউ কেউ আগে থাকতেই, কেউ-বা এখনই খোঁজ-খবর ক'রে নিলেন। ছোটবাবুই কেবল বাড়ি কিনে নিজের বাড়িতে চলে গেলেন। এইবার প্রশ্ন উঠল, বুড়িকে কে নিয়ে যাবে?

কেউই ঘাড় পাতে না।

এমন কি প্রশ্নটাও এড়িয়ে যায়।

সকলেই যেন সকলের আগে সরে পড়তে চান, তার মূলেও ঐ বুড়ি।

এ প্রশ্ন উঠবে, তা সবাই জানে—ওঠবার আগেই সরে পড়তে চায় তাই।

• মেয়েদের ভেতর যাকে প্রশ্ন করা হয়, সে-ই জবাব দেয়, 'তা কী জানি ভাই!—আমরা ত ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে যাচ্ছি, ওকে রাখবই বা কোথায়, দেখবেই বা কে? একটা ঝি রাখারই সাধ্যি থাকলে হয়। ওকে নিয়ে গেলে ত ওর পেছনে একটা লোক চাই।···সেসব দিনকাল যখন ছিল তখন পোষা গেছে। এখন আমাদের কি আর সে ক্ষ্যামতা আছে?···যাবে কারুর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত। প'ড়ে কি আর থাকবে?' দায়িত্বটা কোনমতে এড়িয়ে যায়।

ছোট কর্তা নিজের বাড়িতে গেলেন, তাঁর স্থানাভাবের প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু তিনিই সর্বাগ্রে চ'লে গেলেন। তখন প্রশ্নটা অত উগ্র হয়ে ওঠেনি।

শেষে বড়বাবু তাঁর অফিসে টেলিফোন করলেন, 'কি করবে হে কেষ্টর মার?'

'তা আমি কি বলব দাদা? আপনারা যা ভাল হয় করুন। ওর দেশ-ঘাট কোথায়? সেখানে কেউ নেই? এসে নিয়ে যাক্‌না!'

'বিলক্ষণ! সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতে কার পিসেমশাই। ওর আবার এতদিন পরে কে কোথায় গজাবে? শুনেছি ঠাকুমার বাপের বাড়ির দেশের লোক। সেখানে কেউই নেই বোধহয়। আমি ত এই বাহান্ন বছর বয়সে একদিনও ওকে কোথাও যেতে দেখিনি, ওর কাছেও কেউ আসেনি। কেউ থাকলে কি কখনও শোনা যেত না।'

টেলিফোনেরও ওপ্রান্ত নীরব রইল বহুক্ষণ। শেষে শুষ্ককণ্ঠে উত্তর এল, 'তা' কী জানি। দেখুন আপনারা ভেবে। আমি কিছু করতে পারব না। পূর্বপুরুষের folly-র বোঝা টেনে বেড়ানো আমার কাজ নয়!'

ঠুং ক'রে রিসিভার রাখার শব্দ হ'ল। লাইন কেটে গেল। বড়-বাবু ব্যাপারটা অমীমাংসিত রেখেই নিজে একদিন সরে পড়তে বাধ্য হলেন। তাঁর কন্যাদায়—ছোট ফ্ল্যাট নিতে বাধ্য হয়েছেন। ছেলে-পিলেও বেশী তাঁর। তাঁর পক্ষে এসব বিবেচনা সম্ভব নয়।

এমনি ক'রে সবাই সরে যেতে শেষ যাঁরা থাকলেন—সেজবাবু আর রাঙাবাবু, তাঁরাই পড়লেন ফাঁপরে।

সত্যিই আর কিছু জ্যান্ত মানুষটাকে টেনে ফেলে দেওয়া যায় না! অথচ নিয়েই বা যেতে চায় কে—এ ক্ষেত্রে!

শেষে রাঙাবাবুর সম্বন্ধী খবর আনলেন, কোথায় যেন একটা অনাথ আশ্রম আছে। সেখানে গোটা কতক টাকা দিলে তারা ভার নিতে রাজী আছে। তোমরা ন'ভাই একটা ক'রে টাকা দিলেই ন-টা টাকা। ছোট কর্তা হয়ত একটা বেশীও দিতে পারে—তাহলেই দশ টাকা হবে। মাসিক দশ টাকা দিলেই হয়ে যাবে।

সেজবাবু ভাইদের আফিসে আফিসে ছুটোছুটি ক'রে প্রথম মাসের টাকাটা তুললেন। রাঙাবাবুর সম্বন্ধী গিয়ে টাকাটা জমা দিয়ে এলেন। এখন একটা রিক্সা ডেকে ওকে নিয়ে যাওয়ার ওয়াস্তা!

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল রাঙাবাবুর।

কথাটা বুঝতে কেষ্টর মার সময় লাগল বহুক্ষণ। সে কেবলই ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তার ঘোলা দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে আর মধ্যে মধ্যে বিড়বিড় ক'রে বকে। শেষে অনেক কষ্টে যখন এইটুকু বুঝলে যে তাকে বাইরে যেতে হবে—তখন সোজাসুজি বেঁকে বসল, 'না বাপু, তা আমি পারব না। মা মানা ক'রে গেছে এ বাড়ির চৌকাঠ ডিঙ্গুতে। মেজ মাসিমাও বারণ করেছিল। আমি কোথাও যেতেটেতে পারব না।

• কাকুতি-মিনতি—অনেক কিছুই করা হ'ল। লোভ দেখানো হ'ল নানারকম। বাড়ি যে বিক্রী হয়ে গেছে সে কথাটাও বোঝাবার চেষ্টা করা হ'ল। কিন্তু কেষ্টর মা অচল, অটল। সেজবাবু ত' প্রায় ক্ষেপে ওঠবার দাখিল, শেষে তিনি জোর ক'রে টেনে নিয়ে যাবার উপক্রম করতেই, বুড়ি দু'হাতে সিঁড়ির থামটা ধরে মড়াকান্না জুড়ে দিলে। অপ্রতিভ হয়ে ছেড়ে দিলেন সেজবাবু।

'এখন উপায়?'···সরব ও নীরব প্রশ্ন চারিদিকে।

রাঙাবাবু রাগ ক'রে বললেন, 'উপায় আর কি। থাক্ পড়ে। আমরা যা করবার সবই করেছি—এখন ত' আর আমাদের কেউ দায়ী করতে পারবে না!'

সেজবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, 'কিন্তু—চাবি?

যাঁরা বাড়ি কিনেছেন তাঁরা ভদ্রতা ক'রে তিনমাস সময়

দিয়েছিলেন। কাল সেই তিনমাস শেষ হবে। এঁরাও যাবার জন্য প্রস্তুত অবশ্য। কথা আছে বাড়ি খালি ক'রে তালা লাগিয়ে চাবি ওঁরা তাঁদের পৌঁছে দেবেন।

অনেকক্ষণ দুই তরফের কর্তাগিন্নীরা নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর সেজগিন্নী বললেন, 'তালা লাগিয়ে দিয়ে যাও—তারা এসে খুলে যা হয় করবে'খন্।'

'তারা যদি এখন কিছু দিন না খোলে? বুড়ি যে মরে পচে থাকবে!' রাঙা গিন্নী বলে ওঠেন।

'তবে যা ভাল বোঝ করো?'

পুলিস ডাকা হবে নাকি?

'আচ্ছা, সেই অনাথ আশ্রমের লোকদের বললে কী হয়?'

কে যেন প্রশ্ন করলে।

রাঙাবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'উঁহু।—সে তারা স্পষ্টই বলে দিয়েছে। অত হাঙ্গামা তারা করতে পারবে না।'

অনেক বিবেচনার পর ঠিক হ'ল যে বড়বাবুই যখন বাড়ির কর্তা তখন তাঁকে জানানোই ঠিক।

পরের দিন দু'পক্ষই প্রায় এক সময়ে বেরোবেন। তালাটা আর তাঁরা লাগাবেন না। যাবার সময় রাঙাবাবু গাড়িটা ঘুরিয়ে ঘটনাটা বড়বাবুকে বলে যাবেন—যা করবার তিনিই করবেন। চাবি দিতে হয় দেবেন—নয়ত নতুন মালিকদের জানিয়ে দেবেন, তারা যা হয় করবে, তাদের গরজে।

পরামর্শটা সকলেরই প্রাণে লাগল। নিশ্চিন্ত হ'ল—কতকটা।

যাচ্ছে এরা কিছুদিন থেকেই। সুতরাং ঘটনাটা কেষ্টর মার গা-সওয়া হয়ে গেছে। সে আর প্রশ্ন করে না। কেন যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে—জানতেও চায় না।

আজকাল যেন কোন কথাই মাথাতে ঢোকেও না ওর—শোনেও কম, শুনলেও ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে। সমস্ত অর্থটা ঠিক বোঝে না।

আজও যাবার সময় রাঙা বউ যখন এসে কানের কাছে চিৎকার ক'রে বললে, 'দোরটা দাও কেষ্টর মা, আমরা চলে যাচ্ছি।' তখনও সে কিছু বুঝলে না, শুধু বললে,—'সে আমি দোব অখন!' বলে বার-কতক ঘাড় নাড়লে আপন মনেই।

ওরা চলে যাবার পর সত্যিই এসে হাতড়ে হাতড়ে দোরটা বন্ধ করলে। তারপর তেমনি হুম্ড়ি খেয়ে পড়ে দেওয়াল ধরে ধরে সিঁড়ির মুখটায় এসে একবার ওপর দিকে চেয়ে আপনমনেই বললে, 'ওমা, এরা সব গেল কোথায়? কই কাউকে ত দেখছি না!'

আস্তে আস্তে তখনকার মত গিয়ে শুয়ে পড়ল কেষ্টর মা।

ক্রমশ অপরাহ্ণ সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে গেল। আব্ছা অন্ধকার ঘনিয়ে এল চারদিকে।

আবার উঠল কেষ্টর মা।

'ওমা, এরা কেউ আলো জ্বালে না কেন রে? অরে অ কেনা, অ বিন্দী!'

তারপর আপনিই এসে দেওয়ালে হাত বুলোতে বুলোতে সুইচ্টা টিপে দেয়।

কিন্তু আলো জ্বলে না।

তিনদিন আগেই লাইন কেটে দেওয়া হয়ে গেছে। এ দু'দিন

তেলের আলো জ্বলেছিল। তাও বুড়ি লক্ষ্য করেনি।

'ওমা, আলোটাও যে জ্বলছে না!'

অন্ধকারে খানিকটা জড়ভরতের মত বসে থাকে বুড়ি।

তারপর আবারও বলে, 'বাড়িতে কি কেউ নেই নাকি? গেল কোথায় সব?'

আরও খানিকটা পরে খুন্ খুন্ ক'রে কাঁদতে বসে, 'আমার যে ক্ষিদে পেয়েছে!'

এবেলার মত খাবার কিছু কিছু ওর ঘরেই রেখে দিয়েছিল ওরা মাটির একটা হাঁড়ি ক'রে, বলে গিয়েছিল, 'এই রুটি তরকারী রইল, খেও খিদে পেলে! বুঝলে?'

কিন্তু সে-কথা বুড়ির মনে নেই। তাছাড়া সে খাবারও বেড়ালে খেয়ে গেছে। বুড়ি তখন ঘুমোচ্ছিল।

আফিং খাবার সময় হয়েছে।

'ওরে, আমাকে একটু চা দেনা রে!' নাকিস্বরে বুড়ি কাঁদে।

অনেকক্ষণ ধরে কাঁদে সে।

তারপর সিঁড়ির রেলিংটা ধরে উঠে দাঁড়ায় আস্তে আস্তে, হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ওপরে ওঠে।

বৌদের নামগুলো আজ হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায়।

'অ বিরজা, অ লীলা বৌ। তোমরা কোথায় গেলে গো!'

দোতলা থেকে তেতলা।

অকস্মাৎ আচ্ছন্ন চৈতন্যের মধ্যে কেমন ক'রে কথাটা ঢোকে। কেমন ক'রে এক সময় বুঝতে পারে যে বাড়িতে কেউ নেই, সব খালি।

'খালি বাড়ি? সবাই চলে গেছে? ওমা, আমি কোথায় যাবো গো?···ওমা, আমার যে বড্ড ভয় করছে গো—'

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে এক সময় একটা ধাপ বুঝতে পারে না—হুম্ড়ি খেয়ে পড়ে—গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচে এসে থামে। একটাও শব্দ করে না বুড়ি, কাঁদেও না। হয়ত কিছু বুঝতেও পারে না।

কেমন যেন ঘুম পায় ওর।

'ও মেজো মাসিমা, চা দেবে না একটু?'

একবার শুধু অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করে।

বড়বাবু অফিস থেকে ফিরে সংবাদটা পেয়েছিলেন। সর্বাঙ্গ জ্বলে গিয়েছিল তাঁর রাগে। খানিকটা চেঁচামেচি দাপাদাপিও করেছিলেন—ভাইদের অবিবেচনার জন্য। কিন্তু আর কিছুই সে রাত্রে ক'রে উঠতে পারেননি।

অনেক ভেবে পরের দিন সকালে নতুন বাড়িওলাদের খবর পাঠিয়ে দিলেন—'বাড়ি তোমরা চাবি দিয়ে এসো গে। বাড়ি খালি।'

যা শত্রু পরে পরে! যা হয় ওরা করুক।

বাড়িও'লারা বিকেলের আগে আসবার ফুরসুৎ পেলে না। তখনও কিন্তু ঢোকা গেল না। দরজা বন্ধ ভেতর থেকে। ফিরে গিয়ে বড় বাবুকে খবর দিলে তারা।

বড়বাবুকে তখন কথাটা খুলে বলতে হ'ল। বললেন, 'তোমরা ভাই কেউ গাড়ি করে ওকে অনাথ আশ্রমে পৌঁছে দাও। গাড়ি ভাড়া আমি দেব। তোমাদের কথা হয়ত শুনবে, আমরা হাজার হোক্ চেনা লোক কিনা, জন্মে ইস্তক্ আমাদের দেখছে—আমাদের কাছে বায়নাক্কা করে নানা রকম!'

এরা তাতে রাজী হয়নি প্রথমটা। কিছু বাদানুবাদও হয়েছিল। কিন্তু এই করতে করতেই রাত হয়ে গেল। কিছু করা হ'ল না। পরের দিন সকালে লোকজন এনে দোর ভেঙ্গে এরা ঢুকলে।

সিঁড়ির মুখটাতেই বুড়ি কেষ্টর মা মরে পড়ে আছে। বোধহয় বহুক্ষণ মারা গেছে। পিঁপড়েতে দুটো চোখই খেয়ে শেষ ক'রে ফেলেছে।

বাস্তব দর্শন

পুজোর সামান্য কিছু আগেই সেবার বেরিয়ে পড়েছিলাম। জায়গাটাও ঠিক ছিল—রাজগীর। পুরোনো বাতের ব্যথাটায় কিছুদিন থেকেই বড় কষ্ট হচ্ছিল, তাই স্থির করেছিলাম কয়েকটা দিন ওখানকার পাহাড়ে-গরম-জল লাগিয়ে আসব।

রাজগীর এর আগেও একবার এসেছিলাম। কিন্তু সে অনেকদিন আগে। এবার এসে দেখলাম স্টেশনের কাছে বেশ ভাল ভাল বাড়ি হয়েছে, বাড়িওয়ালাদের মধ্যে কেউ কেউ বাঙ্গালীও আছেন। অর্থাৎ প্রধান অসুবিধা যেটা এদেশের বাড়ির জানলা ও বাথরুমের অভাব, সেটা কতকটা দূর হয়েছে। প্রথম দিনটা ধরমশালাতে কাটিয়ে ওরই ভেতর একখানা ঘর খুঁজে নিলাম। ব্যারাকমত বাড়ি, এক-একখানা ঘর, তার ভেতর দিকে উঠান বাথরুম রান্নাঘর—যাকে সোজা বাংলায় (?) বলে—সেল্‌ফ্‌ কন্‌টেন্‌ড্‌। এমনি সার সার, কেবল বাইরের বারান্দাটা টানা ; তা নইলে অপর ঘরের বাসিন্দাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই।

বেশ লাগল নতুন বাসা। যদিও পাহাড়ের দিকে পেছন-ফেরা, বারান্দায় না বেরোলে পাহাড় দেখবার কোন উপায় নেই, ঘর থেকে শুধু চোখে পড়ে রেলওয়ে সাইডিং-এর স্তূপাকার কয়লা এবং শান্টিং-এর কুশ্রী দৃশ্য—তবু ভালো বাসারও একটা আকর্ষণ আছে বৈ কি ! আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্য, জীবনে এর দামও কম নয়। যাঁরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখলে সত্যিই আহার নিদ্রা ভুলে যান—এমন লোক খুব

বেশি নেই পৃথিবীতে, যাঁরা আছেন তাঁরাও—আমার বিশ্বাস—কিছু অতিশয়োক্তি অথবা অভিনয় করেন।

সে কথা থাক্। রাজগীরের কথায় ফিরে আসা যাক।

বেশ আরামেই কাটল ক'দিন। আরাম এবং শান্তি। স্বামী-স্ত্রী ছুটি প্রাণী গিয়েছি। প্রথম প্রণয়ের বাড়াবাড়ির সময় কেটে গেছে—নিত্য ঝগড়া হওয়ার সময় এখনও আসে নি, আমাদের সেই অবস্থা। কাজেই কোথাও কোন অশান্তি নেই। ওখানে গিয়ে ঝি পাওয়া গিয়েছে—সুতরাং গৃহিণীর মুহুর্মুহু চা দিতেও আপত্তি নেই। বাইরে বসবার জন্য একটি চেয়ার সংগ্রহ করেছি। সঙ্গে আছে বাছাই-করা ইংরেজী গোয়েন্দাকাহিনী—একেবারে যাকে বলে আদর্শ অবস্থা। শান্তির নীড় নয়—সুখস্বর্গ।

সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বাঁধা রুটিন। ভোরে উঠেই একবার চা। বেলা সাতটায় মুখহাত ধুয়ে ছোটেলালের উৎকৃষ্ট দেশী ঘিয়ে ভাজা জিলাপীর সঙ্গে আর এক প্রস্থ চা খেয়ে বাজার। বাজার থেকে ফিরে বাইরের চেয়ারে বসে বা খাটিয়ায় গা এলিয়ে নভেল পড়া ; তার ফাঁকে ফাঁকে গৃহিণীর আদর-করে-দেওয়া আলুভাজা অথবা পাঁপড় কিংবা নিম্‌কী। আর একবার চায়ের আবেদন ক'রে তর্জ্জন লাভ এবং পরে উৎকৃষ্ট এক কাপ চা। এর ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য যুবতী গোয়ালিনীর সঙ্গে দুধের ও ঘিয়ের দরদস্তুর ; কোন কোন দিন মৎসগন্ধারও দেখা মিল্‌ত। এগারোটা নাগাদ প্রায় এক পুষ্পকরথে চড়ে স্নান করতে যাওয়া, ফিরে এসে আহারান্তে কিছু দিবানিদ্রা। এই সময় কলকাতার গাড়ি এসে পৌছত। যাত্রীরা কে নামল—সেটা দেখাও একটা নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ ছিল। তারপর বিকেলে চা, সন্ধ্যায় স্নান—ফেরবার পথে ছোটেলালের দোকানে আর একবার কিছু নমস্কারী দেওয়া, বাড়ি

ফিরে চা কিংবা দুগ্ধ পান (গৃহিণী শরীর ভাল করবেনই আমার)—আবার নভেল পড়া (গৃহিণী এই সময়টা যে দিন পাড়া বেড়াতে যেতেন অবশ্য সেই দিনই—নচেৎ মনোযোগ দিয়ে বসে তাঁর বাপের বাড়ির বহুবার শ্রুত কাহিনী শুনতে হ'ত !)—তারপর আহার ও নিদ্রা।

অর্থাৎ জীবনটা বেশ মন্দ্রাক্রান্তা ছন্দেই বয়ে যাচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে শুধু গোলমাল বাধাতেন মালেকান্—'এখানে যাবো' 'ওখানে যাবো' বলে, গৃধ্রকূট, পাওয়াপুরী—এই সবের বায়নাক্কা তুলে। প্রথম প্রথম বাতের অজুহাতে কাটান দিয়েছি। শেষে চেষ্টা করেছি ও-পাশের দোতালাবাড়ির মহিলাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে—নিতান্ত না পারলে যেতেও হয়েছে সঙ্গে দু-একদিন। নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামের যে সুখ তা ওঁদের বোঝানো কঠিন। কারণ যাঁরা দিবানিদ্রা দিয়েই সারা জীবনটা কাটিয়ে দিলেন, তাঁরা ওর মর্ম কি বুঝবেন ? পিতৃ-ক্রীত পাঁচসিকে জোড়ার মালার বদলে আজীবন পেন্সন্ ভোগ করেন যাঁরা, তাঁরা স্বামীর আয়ে বসে খেয়েই শুধু খুশি নন—স্বামীকে সর্বদা উপগ্রহের মত নিজের পাশে ঘোরাতে চান।

হ্যাঁ—মোটামুটি শান্তিতেই ছিলাম।

ছিলাম যে তার কারণ আমাদের ঠিক পাশেই কোন প্রতিবেশী ছিল না। প্রতিবেশী থাকবে অথচ অশান্তি থাকবে না—এমনটি বোধ হয় মনুষ্যসমাজে ঘটা সম্ভব নয়। ঐ ব্যারাকের সব কটি ঘরেই লোক ছিল, শুধু ছিল না আমার পাশের ঘরে। তার পাশের ঘরে জন-তিনেক মহিলা ক্রীশ্চান শিক্ষয়িত্রী এসেছিলেন, তাঁরা কারুর সঙ্গে মিশতেন না—স্নান ও বাজারের সময় ছাড়া সব সময় ঘরে বসে উচ্চৈঃস্বরে পরনিন্দা করতেন। তার পাশে এসে উঠেছিলেন এক মাদ্রাজী

পরিবার, দেখা হ'লেই মিষ্ট হাসতেন—কিন্তু ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করেন নি। তারও পাশের একটা পৃথক বাড়িতে একটি বাঙ্গালী ও একটি পাঞ্জাবী পরিবার ছিল, তাঁদের সঙ্গে আমার স্ত্রীর খুব অন্তরঙ্গতা হয়ে গিয়েছিল, তারই ঢেউ মধ্যে মধ্যে এসে যা আমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছত, তা না হ'লে সত্যিই বেশ ছিলাম।

কিন্তু অত সুখ বিধাতার সইল না। বাড়িওয়ালার বিহারী প্রতিনিধি একদা এসে জানালেন যে, ও-ঘরের ভাড়া হয়ে গেছে, আগামী কালই ভাড়াটেরা এসে পৌঁছবেন। আমাদের ঝিকে দিয়েই তিনি ঘরটা একটু ধুইয়ে রাখলেন। আমার স্ত্রী বললেন, বাঁচা গেল, রাত্রে ঘরটা ফাঁকা হা-হা করে, কেমন যেন ভয় লাগত!

আমি শুধু মনে মনে বললাম, কী আপদ!

এলেন তাঁরা পরের দিন। স্বামী স্ত্রী ও একটি চাকর। স্ত্রীটি সুশ্রী, তরুণীও বটে, কিন্তু অলঙ্কার ও বেশভূষার বড় বাহুল্য। স্বামীটিও একটু—কী বলব—কেমন ধরণের, অতিরিক্ত টেরী, ঘাড়-চাঁচা, পাৎলা আব্‌রোঁয়ার পাঞ্জাবি আর গিলেকরা ধাক্কা-দেওয়া ধুতি—সব মিলিয়ে একটি মাত্রই ইঙ্গিত করে। মাল কিছু বেশিই, তার সঙ্গে আবার একটি হারমোনিয়ামের বাক্স। সখ আছে বটে।

তাঁরা এসেই সোজা ঘরে ঢুকে গেলেন। আমাদের দিকে তাকালেন না পর্যন্ত, আলাপ করা ত দূরের কথা। চাকরটিই মালপত্র গুছিয়ে ছুটোছুটি করে বাজার-হাট এনে সংসার পেতে বসল। সে-ই একবার এসে আমার কাছ থেকে কোথায় কি পাওয়া যায় সন্ধানসুলুক জেনে নিয়েছিল। ওঁরা কিন্তু আর একবারও ঘর থেকে বার হন নি।

কিন্তু তার দ্বারা তাঁরা দুর্বল পুরুষকেই শুধু তাঁদের রহস্য থেকে বঞ্চিত করতে পারলেন, প্রবলা নারীর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার যো কি তাঁদের? আমার স্ত্রীর ত আহারনিদ্রা ঘুচে গেল। তিনি নানাভাবে বাহ্যিক নিস্পৃহতা দেখান অথচ সুযোগ পেলেই উঁকিঝুঁকি মারেন। অবশেষে রাত আটটা নাগাদ তাঁর স্টক-টেকিং হয়ে গেল, হাঁপাতে হাঁপাতে এসে জানালেন, 'হ্যাঁ গো, ওরা যেন কেমন কেমন!'

'কেমন কেমন মানে?'

'মানে এই ইয়ে—ওরা ঠিক—মানে ঐ মেয়েটা ঠিক বিয়ে করা নয়।'

'কি করে জানলে? ওর ত সিঁথিতে সিঁদুর রয়েছে!'

'ও, তুমি ঐটুকুর ভেতর তা-ও দেখেছ?' সকোপ কটাক্ষে গৃহিণী চান আমার দিকে, 'কিন্তু তা থাকলে কি হবে? সিঁদূর কৌটো নেই যে সঙ্গে!...এখন মেয়েটা চান ক'রে এসে দাঁড়াতেই পুরুষটা ফিস ফিস ক'রে বললে, সিঁদুর পরো মনে ক'রে এই বেলা। তাতে মেয়েটা কি উত্তর দিলে জানো? বললে, ঐ যা, সিঁদুরটা ফেলে এসেছি দ্যাখো! ...ছোট্ট সুটকেসটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলে—ওতে ওর সব টয়লেটের জিনিসই বোঝাই কিনা—কিন্তু সিঁদুর নেই!'

'তাতে আর কি হয়েছে। ভুল ত হতেই পারে!'

'ভুল—এমন সাংঘাতিক ভুল! বাঙালীর ঘরের সধবা মেয়ে সিঁদুর কৌটো নিতে ভুল করবে? মনে ত হয় না। অনব্যেসের ফোঁটা, কপাল চড়-চড় করে।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'দেখো, ও কখনও ভদ্রঘরের নয়—নষ্ট মেয়েমানুষ!'

'ছিঃ!' একটু ভর্ৎসনাই করি আমি, 'ওসব কথা বলতে নেই।

কে কি, তা প্রথম নজরে বোঝা যায় না। আগে থাকতেই সন্দেহ করে বসতে নেই।'

গৃহিণী কিন্তু কিছু মাত্র নিরুৎসাহ বোধ করলেন না। মাথা নেড়ে বললেন, 'আচ্ছা, দেখো তুমি!'

এর পর দিন দুই কাটল নিরুপদ্রবে। ওঁরা একদিন মাত্র স্নান করতে গিয়েছিলেন। বেড়াতেও যান না কোথাও। দিনরাতই ঘরে বসে থাকেন। জানলায় (বোধ করি আমার গৃহিণীর উপদ্রবেই) বেশ ভারী করে পর্দা টানিয়েছেন। সন্ধ্যা হতে না হতে জানলাটাও বন্ধ করে দেন। দরজাটা ত বন্ধ থাকেই। চাকর শুধু মধ্যে মধ্যে আসা-যাওয়া করে কিন্তু যত বারই যাতায়াত করে, কপাটটা সন্তর্পণে বন্ধ করে যায়। এত সতর্কতার কারণটাও অজানা রইল না, বিলাতী সুরার তীব্র সৌরভ আর কত ঢাকা যায়? এমন কি দ্বিতীয় সন্ধ্যায় আমার স্ত্রীও নাক সিঁটকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ গো, কিসের একটা গন্ধ ছাড়ছে বল ত?'

পাছে পরোক্ষভাবে তাঁর মতেরই সমর্থন করতে হয়, তাই বললাম, 'কে জানে!...কই, আমি ত পাচ্ছি না!'

তৃতীয় দিনে হারমোনিয়াম বাজল। সেদিন জানলাটা বন্ধ হয় নি পুরোপুরি। সুতরাং গানও শোনা গেল। মেয়েটির গলা ভাল, তবে গানের বাণীটা আর যাই হোক, ঠিক সুরুচিসঙ্গত নয়।

আমার স্ত্রী বিজয়গর্বেই মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'দেখলে? মিলয়ে পাচ্ছ ত?'

আমি অনাবশ্যক বোধে আর কথা বাড়ালুম না।

ওখানে শয়নপর্বটা সারা হ'ত একটু তাড়াতাড়িই। এত তাড়াতাড়ি যে কলকাতার লোক শুনলে হাসবে। এক একদিন আটটার মধ্যেই শুয়ে পড়তুম। কাজটা কি বলুন ? সন্ধ্যা থেকে দুটি প্রাণীতে আর কত গল্প করা যায় ? তা ছাড়া কলকাতায় থাকতে পুরোপুরি ঘুমটা তো কখনই হয় না—বিদেশে এলে সেটাই পুষিয়ে নিতে ইচ্ছা করে।

সেদিনও আমরা শুয়ে পড়েছি খুব সকালে। খানিকটা পরে—আমাদের মনে হ'ল বেশ এক ঘুমের পরে কিন্তু উঠে দেখি, মোটে রাত দশটা—প্রবল চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল। কারা যেন চীৎকার করছে, কী যেন একটা ভাঙল ঝন্ ঝন্ ক'রে।

চমকে ঘুম ভেঙে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলাম।

চেঁচামেচিটা বেশী দূরে কোথাও নয়, আমারই পাশের ঘরে। আর একটু কান পেতে শুনতেই বোঝা গেল দুজনে ঝগড়া হচ্ছে। কণ্ঠস্বরে উচ্চতা যথেষ্ট থাকলেও জড়তা কম ছিল না।—অর্থাৎ দুজনেরই মত্ত অবস্থা।

ভদ্রতার ওপর কৌতূহলের জয় হ'ল। জানলাটা অর্ধেকের ওপর খোলা, পর্দা থাকলেও তার ফাঁক দিয়ে দেখবার অসুবিধা নেই। কাছে এসে ভেতরের দিকে চাইলাম।

মেঝের মাঝখানে একটা বড়-গোছের জাজিম পাতা, তার দুই প্রান্তে দুজন। মাঝখানে হারমোনিয়মটা তখনও পড়ে আছে, এমন কি তার বেলোটা পর্যন্ত টিপে বন্ধ করা হয় নি। আর তার চার পাশে কতকগুলো খালি বোতল—মদের ও সোডার—মাংসের প্লেট, এঁটো হাড়, সিগারেটের টুকরো, দেশলাইয়ের কাঠি—একেবারে ছত্রাকার ক'রে ছড়ানো। পুরুষটি তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে, স্ত্রীলোকটি অকথ্য

এবং অশ্রাব্য ভাষায় তাকে গালিগালাজ করছে। মেয়েটা উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার দুই চোখ রক্তবর্ণ, বেশভূষা আলুথালু, সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পেরে ক্রমাগত টলছে। অবস্থান দেখে বোঝা গেল ইতি-পূর্বে শ্রীমতী ছটি কাঁচের গেলাস লোকটিকে লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়েছে, কিন্তু দৃষ্টি এবং হাত কোনটাই প্রকৃতিস্থ না থাকায় ছটাই ওদিকের দেওয়ালে গিয়ে লেগে ভেঙেছে। এবার তুলেছে সোডার বোতল, বোতলটা বার বার তাগ করছে আবার সেটা সম্বরণ করে নিয়ে খানিকটা ক'রে গালা-গাল দিচ্ছে। আমরা গিয়ে দাঁড়াতেই কানে গেল মেয়েটা বলছে, 'লজ্জা করে না তোর, বন্ধু অসুখ হয়ে চেঞ্জে গেছে আর তুই তার মেয়েমানুষকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিস! বেইমান, বিশ্বাসঘাতক, ইস্টুপিড কোথাকার! আবার আমাকে স্তোক দেওয়া—আজ আসবে কাল আসবে ক'রে! তোকে আমি খুন করব। তোর রক্ত মেখে আমি নাচব ধেই ধেই ক'রে!'

লোকটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে ছিল, এবার একটু উঠে বসে ব্যঙ্গের সুরে বললে, 'থাম্ থাম্—সতী সাবিত্রী এলেন একেবারে! বুকে হাত দিয়ে বল্ দিকি, জেনে শুনে এইছিস কিনা!···এই ক'দিনে এক মোট টাকা তোর পেছনে খরচ করলুম, সে কি অমনি!'

ঝন্ ঝন্ ক'রে সোডার বোতলটা ভাঙল। এবারেও দেওয়ালে গিয়েই লাগল—লোকটার গায়ে নয়।

আর এক দফা অকথ্য গালাগালি—দু পক্ষেই।

এই সময় বাইরে পদশব্দ। ফিরে দেখি ওদেরই চাকর শিবু উঠছে বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে। হাতে ভিজে কাপড়—এই এতরাত্রে বোধ হয় কুণ্ডে গিয়েছিল স্নান করতে।

ওকে ডেকে বেশ একটু ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই বললুম, 'শিবু, ভদ্দরলোকের

পাড়ায় এসব কি ? আমি কিন্তু এখুনি পুলিশে খবর দেব বলে দিলুম।'

ওপাশের ঘর থেকে ক্রিশ্চান মহিলারাও বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁরাও এগিয়ে এলেন, একজন বললেন, আপনি না যান—আমরা যাব পুলিশে। আমরা প্রোফেসারী করি—আমাদের প্রেষ্টিজ আলাদা।'

শিবু বিষম কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল, 'শুরু করেছে বুঝি ! আঃ—একদণ্ড কি আমার কোথাও যাবার উপায় নেই ! এসে ইস্তক তো বেরোতে পারি নি। বলি যে, এখানে লোকে কত পয়সা খরচ ক'রে চান করতে আসে—আমি এসেও চান না ক'রে চলে যাবো ? আর যে বেশীদিন থাকা হবে না তা তো বুঝতেই পারছি। তাই আজ এত রাতে নটার পর বেরিয়েছি। আপনি রাগ করবেন না বাবু, ও আমি থামিয়ে দিচ্ছি এখনই।'

সে দ্রুত দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল—ক্রীশ্চান মহিলারা দল বেঁধে তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন—তাঁদের মুখের সামনেই প্রায় সজোরে এবং সশব্দে বন্ধ ক'রে দিলে কপাটটা।

আমার স্ত্রী বিজয়গর্বে ওঁদের দিকে তাকিয়ে জানলার কাছে গিয়ে উঁকি মারলেন। বলা বাহুল্য আমিও মহাজন-পদাঙ্ক অনুসরণ করলুম। কৌতূহল বড়ই প্রবল হয়ে উঠছে ক্রমশ।

শিবু ভেতরে ঢুকেই ভিজে কাপড়টা একপাশে ফেলে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে ; ওকে দেখেই যেন সে ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সে সুযোগ আর শিবু দিলে না। কাছে এসেই ঠাস ঠাস করে গোটা পাঁচ ছয় চড় কষিয়ে দিলে মেয়েটার দুই গালে। বেশ সজোরেই —দেখতে না পেলেও অনুমান করলুম যে দুই গালে দাগ বসে গেল আঙুলের।

কিন্তু তাতেই শেষ নয়—চুলের ঝুঁটি ধরে তাকে হিড হিড় ক'রে

টানতে টানতে নিয়ে গেল বাথরুমে। একটু পরে যখন ফিরে এল তখন মেয়েটার আপাদমস্তক ভিজে। মাথা দিয়ে, কাপড়-জামা দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল পড়ছে। বুঝলুম বেশ কয়েক বালতি জল পড়েছে মাথায়।

ঘরে ফিরিয়ে এনে মেঝেতে দাঁড় করিয়ে রাখলে মেয়েটাকে, ছোট্ট মেয়েটির মতই। তারপর একটা তোয়ালে এনে মাথা মুছিয়ে শুকনো কাপড়-জামা হাতে দিয়ে বললে, 'যাও, ভিজে কাপড় ছাড়ো গে!'

আশ্চর্য ব্যাপার। মেয়েটা যেন কেঁচো হয়ে গেছে। একটা কথাও না বলে কাপড়-জামা নিয়ে ভেতরের দিকের অন্ধকার বারান্দায় চলে গেল। জবরদস্ত বাপদের শাসনে মেয়েদের যে অবস্থা হয়—ওরও প্রায় সেই রকমই।

এবার শিবু একটা ঝাঁটা এনে কাঁচের গুঁড়োগুলো ঝাঁট দিতে শুরু করলে। এতক্ষণে বাবুটির কথা ফুটল, যথাসাধ্য সহজ কণ্ঠে বলবার চেষ্টা করলে, 'ছাখ শিবে আমি কাল চলে যাবো!'

শিবু ঝাঁটা ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'ভোর বেলা একটা গাড়ি ছাড়ে এখান থেকে। সেই গাড়িতে উঠে তুমি চলে যেও বাবু। এই ভালয় ভালয় বলে দিলুম। কাল সূর্যোদয়ে যদি তোমার মুখ দেখতে পাই তো তোমার একদিন কি আমার একদিন। শিবুর নাদ্‌না যে কি চীজ তা তো জানই! একদিনে কি শিক্ষা হয় নি?'

বাবু বললেন বটে, 'থাম্ থাম্, মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করিস নি!' কিন্তু খুব ক্ষীণকণ্ঠে—একটুও জোর ফুটল না গলায় আওয়াজে।

আবহাওয়া শান্ত হয়ে এল ক্রমশ। সম্ভবত দুজনেই ওরা ঘুমিয়ে

পড়েছে। বাবুর তো নাক ডাকার শব্দ পাওয়াই যাচ্ছে। খুট-খাট আওয়াজ হচ্ছে—শিবুর ঘর গোছাবার। আর কোন উত্তেজনা নেই দেখে প্রচণ্ড এক হাই তুলে আমার গৃহিণী শুতে চলে গেলেন। কিন্তু আমার ঘুম তখন দস্তুরমত চটে গিয়েছে, আমি বাইরের চেয়ারখানাতেই বসে রইলুম।

খানিকটা পরে খুট ক'রে দরজা খুলে বেরিয়ে এল শিবু, অভ্যাস-মত আবার সাবধানে কপাট বন্ধ ক'রে আমার কাছে মেঝেতেই এসে বসল। বললে, 'বাবু, কিছু মনে করবেন না, একটা বিড়ি ধরাই!'

বললাম, 'ধরাও, ধরাও। যা খাটুনীটা খাটলে!'

বিড়ি ধরিয়ে নিঃশব্দে গোটা-কয়েক টান টেনে শিবু বললে, 'দেখলেন তো বাবু কাণ্ডটা! একটা মিনিট আমার কোথাও যাবার উপায় নেই। এক বোতলের পর দু-বোতল পড়ল কি একেবারে দশবাই চণ্ডী। কেলেঙ্কার একটা করবেই! আমি থাকলে সামলে রাখি, না থাকলেই খাবে। আমি বাক্সয় পুরে চান করতে গিয়েছি—চাবি খুলে বার ক'রে টেনেছে দুজনে। আর ও-ও তেমনি ছ্যাঁচড়া। বাবুর বন্ধু তুই, বিশ্বাস ক'রে মেয়েমানুষের কাছে নিয়ে এসেছে, আসা-যাওয়া করতে দেয়—তুই তার সঙ্গে এমনি বেইমানিটা করলি! সে রইল হাসপাতালে পড়ে আর তুই মিছে কথা বলে নিয়ে এলি! আমি ঠিক ধরেছিলুম বাবু, আমার চোখ এড়াবে এতবড় ধুত্তু ও এখনও হয়নি! বললুমও ওকে তা বললে, মরুকগে, তাই যদি হয় তো কি করা যাবে, শখ হয়েছে যখন মিটিয়ে নিক। খরচাও তো করবে দুশো-পাঁচশো। ধর্ যদি তোর বাবু মরেই যায়—আমাকেও তো দাঁড়াতে হবে। এই সব!...হাত্তোর মেয়েমানুষ রে! এমন স্বার্থপর জাত আর যদি দুটি দেখেছেন!'

আমি একটু হেসে বললুম, 'কিন্তু তাই বলে তুমি মনিবকে মেরে

বসলে, তোমার সাহস তো কম নয়!'

'তা নইলে ওকে সামলাতে পারব কেন বাবু! ঐ ওর এক ওষুধ!'

'রাগ করে না?'

'পাগল হয়েছেন! এত করবে কে? এর আগে আগে যত চাকর রেখেছে সবাই ওর গয়না মেরে সরে পড়েছে। দু'বোতল পেটে পড়লেই তো বেহুঁশ। সেই তো মওকা।...আমি এসে তবে তো দুটো পয়সার মুখ দেখেছে। গয়নাও জমেছে, টাকাও জমেছে। টাকা তো আমি বাড়িতে রাখতে দিই না—কিছু এলেই ব্যাঙ্কে দিয়ে আসি। আর গয়না থাকে লোহার আলমারীতে, সে চাবি আমার কাছে, এই কোমরে ঘুন্‌সিতে বাঁধা। এত কে টানবে? আমি তো বলি যে, আমাকে ছেড়ে দাও—তা দেয় কৈ!'

বিড়িটা বকুনির চোটে নিভে গিয়েছিল—আবার ধরিয়ে নিলে। আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললুম, 'তোমার খুব মায়া পড়ে গিয়েছে বুঝি!'

'তা আপনার কাছে মিছে কথা বলব না বাবু,' ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তেই উত্তর দেয় সে, 'তা একটু পড়েছে। এধারে খুব ভাল মেয়েমানুষটা। যখন ঐ ছাইভস্ম পেটে না পড়ে, বেশ থাকে। আদর যত্নও করে খুব। দিল্‌ও আছে। চাকরীতে ঢোকবার মাসখানেক পরেই আমার বউয়ের খুব অসুখ করে—একেবারে থোক দু'শ টাকা হাতে দিয়ে বলেছিল—শিবু, ভাল ক'রে চিকিৎসা করাও গে। কে এত বিশ্বাস করে বলুন ত?'

'বৌ বেঁচে আছে তোমার?

'না না বাবু।...সে সেই যাত্রায়ই পটল তুলেছে।'

'আর বিয়ে করো নি?'

'না বিয়ে আর করি নি বাবু।'

'করো নি কেন? কীই বা তোমার বয়স।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল শিবু। তারপর গলাটা নামিয়ে বললে, 'তাহলে খুলেই বলি বাবু, একটু আশায় পড়েই আর বিয়ে করি নি। বড্ড মায়াটা পড়ে গেছে কিনা—দু পক্ষেই। আমাকে ছাড়ে না, চাকরী ছাড়ব কি? দেশে যাবো বললেই বলে, চ কোন তীর্থে গিয়ে কণ্ঠিবদল ক'রে আমরা বাস করিগে। এসব আর ভাল লাগে না। আমিই বরং বলি, তা কেন, রূপযৌবন যতদিন আছে দু পয়সা কামিয়ে নে। তীর্থে গিয়ে বসলেও পেটটা ত চলা চাই?...যখন বেশ-কিছু জমবে তখন না হয় কোথাও একটা গিয়ে প্রাচিত্তির ক'রে বৈষ্ণব হয়ে কণ্ঠী বদল করা যাবে। কী বলেন বাবু, ঠিক বলি নি? তা ছাড়া ধরুন না কেন, যখন কোন অসুবিধেই হচ্ছে না। তখন আর তাড়া কি?'

চুপ ক'রে রইলাম। আমার নীরবতাকে সমর্থন ভেবে নিয়ে শিবু বলে চলল, 'দেশে ঘাটে ভাই-ভাইপোরা আছে—পিণ্ডি দেবার লোকের অভাব হবে না। ও জমি জায়গা তাদেরই ছেড়ে দেব সব। আমরা বুড়োবুড়ি মনে করছি বৃন্দাবনে গিয়েই উঠব—ভাল দেখে একটা গুরু করে নিয়ে তোফা ভগবানের নাম করা যাবে।...আমি গিয়েছি ওদিকে বাবু, সব আমার ঘোরা আছে। রাবড়ী যা সস্তা বাবু বৃন্দাবনে—তখন ত বারো আনা সের মিলত—'

অন্ধকার রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে শিবু ভবিষ্যৎ গৃহস্থালীর একটা উজ্জ্বল ছবিই বোধ করি দেখতে পায়।

সংশয়

সবাই ধন্য ধন্য করলে। শুধু মুখে নয়, অন্তরেও। বাস্তবিক নির্মলা যে এতটা করতে পারবে তা কে ভেবেছিল! শত্রুকবল থেকে আপন শিশুকে ছিনিয়ে আনতে কোন বাঘিনী বা সিংহিনীও এতখানি পারত কিনা সন্দেহ।

অথচ নির্মলার কীই বা সম্বল ছিল?

ওরা ধনী নয়। সাধারণ মার্চেন্ট-অফিসের চাকরী, তাও কোন ইংরেজ এমন কি বাঙ্গালীর বাড়ি নয়, এক মারোয়াড়ীর গদীতে। যা মাইনে পেত তাতে কোন দিনই কুলোয়নি সতীনাথের—আগে একটা টিউশ্যনী করলেই চলত, এখন দুটো করে। একদা সসম্মানে এম-কম্ পাস করেছিল, সেইজন্য ও কাজটা এখনও অনায়াসে জোটে। নিজের বাড়ি নেই; ফ্ল্যাটের ভাড়া দিয়ে, একটি শিশুর খরচা চালিয়ে কলকাতায় থাকা—তাতে এক পয়সা জমবার কথা নয়, জমেওনি। যত্র আয় তত্র ব্যয়—থাকার মধ্যে ছিল বিয়ের সময়কার কয়েকখানা গহনা এবং সতীনাথের মায়ের মৃত্যুর সময়ে পাওয়া খানদশেক গিনি, একটা ইন্‌সিওরেন্সও ছিল কিন্তু তার টাকা পাবার সময় এখনও আসেনি।

রূপ?—না, নির্মলের তাও ছিল না। নিতান্ত সাধারণ চেহারা। একেবারে কুশ্রী নয়, এই পর্যন্ত বলা চলে। আর যাই হোক্, বুদ্ধিমান ও ধনী ব্যবহারজীবীদের প্রভাবিত করার মত চেহারা নয় ওর।

বিদ্যা?

তাই বা কৈ ? তৃতীয় বিভাগে কোনমতে ম্যাট্রিকটা পাস করেছিল বটে। তবে তাতে যে কিছুই লেখাপড়া শেখেনি তা বলা বাহুল্য। আর সেও ত হ'ল ছ' সাত বছরের কথা। কিছু শিখে থাকলেও তা এত দিনে ভুলে যাবার কথা।

তবু—তবু ত সে অসাধ্য সাধন করলে। বলতে গেলে একমাত্র নির্মলারই চেষ্টায় সতীনাথ এতবড় অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়ে সসম্মানে বেরিয়ে এল। শুধু তাই নয়—তার পুরোনো চাকরীও দিতে বাধ্য হ'ল ওর মনিবরা।

অভিযোগ গুরুতর বৈকি !

ওদের অফিসের যে ঘরে বড় সাহেব বসেন, সেই ঘরেই থাকে লোহার সিন্দুক। সে ঘরে আর চীফ্ য়্যাকাউণ্টেণ্ট সতীনাথের ঘরের ভেতর ঠেলা-দোরের মাত্র ব্যবধান। ঘটনাটা যেদিন ঘটে সেদিন ওদের বড়সাহেব (শালা-ভগ্নীপতি দুই অংশীদারের একজন, শ্যালক) সন্ধ্যা ছ'টার সময় যখন অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন, সতীনাথ তখনও বসে কাজ করছে। সতীনাথ ওঠে সাতটায়—ওর সামনেই দারোয়ান রাম-নন্দন ঐ ঘরে চাবি দিয়ে বেরিয়ে আসে। পরের দিন বড়সাহেব এসে রামনন্দনের হাতে চাবি দেন, চাবি খোলা হ'লে যখন নিজের ঘরে ঢোকেন তখন রামনন্দনও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢোকে—জানলা দরজা খুলে চেয়ার টেবিল মুছে দেবে বলে। তাঁরা দু'জনেই একসঙ্গে দেখেন লোহার আলমারীর তালা ভাঙ্গা—একটা পাল্লা খোলা হাঁ হাঁ করছে, ভেতরে বড় দু'টি নোটের বাণ্ডিল নেই। হিসেব করে দেখা গেল, আগের দিনের আদায় করা মোট তেইশ হাজার টাকার ভেতর দশ হাজার টাকা উধাও হয়েছে।

পুলিশ এল। সরেজমিনে যতটা সম্ভব তদারক করলে। নোটের

বাণ্ডিলগুলো এক-একটা কাগজে মুড়েছেন ক্যাশিয়ারবাবু। কাগজে মুড়ে তার গায়ে টাকার অঙ্ক লিখে নিজে হাতে সাজিয়ে রেখে গেছেন। তাতে কোন আঙ্গুলের ছাপ আছে কিনা তার ছবি নেওয়া হ'ল। ফটো ডেভলপ্ করার পর দেখা গেল বাকি বাণ্ডিলগুলোতে ক্যাশিয়ার বাবু ছাড়া যার আঙ্গুলের ছাপ আছে—সে হ'ল সতীনাথ। যার ঐ বাণ্ডিলে হাত দেবার কোন কারণ নেই। কারণ পৌনে ছ'টায় ক্যাশিয়ার বাবু টাকা রেখে সিন্দুক বন্ধ ক'রে গেছেন—ছ'টায় বড়সাহেব বেরিয়েছেন অফিস থেকে। ইতিমধ্যে সতীনাথের ও-ঘরে যাবার কোন কারণ ঘটেনি।

ফটো হস্তগত হওয়ার ঘণ্টাকতকের ভেতরেই পুলিশ যথারীতি সতীনাথকে গ্রেপ্তার করলে। এই ঘটনার আকস্মিকতায় সতীনাথ যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। সে একটি কথা কইলে না, কারুর সঙ্গেই না— তেমনি স্তম্ভিত অবস্থাতে গিয়েই পুলিশ-ভ্যানে উঠল। এমন কি স্ত্রীকে সংবাদ দেবার কথাও সে কাউকে বলে যেতে পারল না।

ওরই সহকারী একটি ছোকরা, যাদব তার নাম, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নির্মলাকে গিয়ে খবরটা পৌঁছে দিলে।

নির্মলা খবরটা শুনে পর্যন্ত সমস্ত রাত কেমন একটা স্তম্ভিত অবস্থায় বসে রইল—আড়ষ্ট, কাঠের মত। একেবারে ওর চমক ভাঙ্গল ভোরের দিকে মেয়েটা কেঁদে উঠতে। এতক্ষণে যেন সম্বিত ফিরল ওর। সহজভাবেই উঠে মেয়েকে খানিকটা দুধ তৈরী ক'রে খাওয়ালে। ততক্ষণ ঝি এসে গেছে। তার কাছে মেয়েটাকে দিয়ে স্নান ক'রে এল। এর পর ঘরদোরের খুঁটিনাটি কাজ সেরে নিজে এক কাপ চা তৈরী ক'রে খেয়ে নিলে। আগের দিনের আহার্য যেমন রান্না তেমনি ছিল—প্রায় সবই ধরে দিলে ঝিকে। ঝি একটু বিস্মিত

হয়ে প্রশ্ন করলে, 'মা, খাবার খাওনি কাল? বাবুকেও ত দেখছি না —বাবু কোথায়?

মুহূর্তকাল সময় লাগল নির্মলার উদ্‌গত অশ্রু সামলে নিতে। তারপর বললে, 'উনি কাল আসেন নি।'

'আসেন নি,—কেন মা?'

'কী একটা ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া ক'রে সাহেবের সঙ্গে মারামারি করেছেন, তাই তারা পুলিশে দিয়েছে।'

'মাগো, কী হবে মা!...তারপর—এখন কি করবে?'

'দেখি কি হয়!'

ঝি কাজ সেরে চলে যেতেই নির্মলা ফ্ল্যাটে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল, বাস বদল ক'রে একেবারে এসে উঠল বাগবাজারে নিজের বাপের বাড়ি। বাপের বাড়ির অবস্থা ভাল না, ওঁরা থাকেন একটি ঘর ভাড়া করে। ওর বিয়ের পরই বাবা মারা যান—ভাইটি তখন ছোট। এই সবে বি এ পাস ক'রে চাকরীতে ঢুকেছে। এখনও সামলে নিতে পারেনি—বিপুল ঋণ ঘাড়ে চেপে আছে। তার পরের ভাইটি আরও ছোট, সবে ক্লাস নাইন্-এ পড়ছে। সুতরাং এখান থেকে বিশেষ কোন সাহায্য পাবার উপায় নেই তা সে জানত, তবে যেটুকু পাওয়া যায় সেইটুকুই নিতে হবে। সে সংক্ষেপে কথাটা মাকে জানিয়ে বলল, 'মা, যে ক'দিন না একটা সুরাহা হয়, আমাকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হবে। আর কেউ নেই—তাই বলে পড়ে পড়ে অদৃষ্টের মার খাবো না। চুরি সে করেনি, করলে টাকাগুলো অন্তত থাকত। টাকা কিছুই প্রায় নেই, তবু আমি সহজে ছাড়বো না, মা।...কিন্তু এই ক'দিন খুকিটাকে তুমি রাখো। ওকে নিয়ে থাকলে পুরুষের কাজটা হবে না —অথচ আমাকেই ত সব করতে হবে, কে আর করবে বলো!'

মা বললেন, 'তা না হয় দেখলুম, কিন্তু তুই-ই বা কি করবি মা
—একা সোমত্থ মেয়ে।'

'দেখি না—কী করতে পারি।'

নির্মলা সেখান থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে এসে উঠল একেবারে হেয়ার স্ট্রীট থানায়। থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ওর শুষ্ক-মুখের দিকে চেয়ে একটু সদয় হয়ে উঠলেন। নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন 'মকদ্দমা-সাহেব' অথবা কোর্ট-ইন্সপেক্টারের কাছে। সেখানে গিয়ে নির্মলা ধীরভাবে সমস্ত অভিযোগ শুনল। দু'একটি প্রশ্ন করে জানলে যে যে-ভাবে সাক্ষ্যপ্রমাণ দাঁড়াচ্ছে তাতে সতীনাথের অব্যাহতি পাওয়া শক্ত।

ভেঙ্গে পড়বারই কথা। নির্মলা কিন্তু ভেঙ্গে পড়ল না। এতটুকু দুর্বলতা বা অবসাদ প্রকাশ পেল না ওর আচার-আচরণে। বরং মনে হ'ল এতখানি সবল সে নিজেকে মনে করেনি কোনদিন। সে বেরিয়ে আসার সময় কোর্ট-ইন্সপেক্টারকে আর একটি প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা এখন ভাল ক্রিমিন্যাল ল'-ইয়ার কে বলতে পারেন?'

তিনি দু'তিনটি নাম ক'রে বললেন, 'এঁদের মধ্যে পাইন সাহেবই ভাল কিন্তু তিনি ত পাঁচশ' টাকার কম কোনদিন দাঁড়াবেন না। এঁরা সবাই সাদা হাতী। অত টাকা খরচ করতে পারবেন? পারলেও I won't advice you—কেস খুব স্ট্রং আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে।'

কিছুক্ষণ শান্ত স্থির দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে নির্মলা প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা, মাঝারি গোছের দু-এক জনের নাম বলুন ত!'

নাম এবং ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে যখন সে থানা থেকে বেরোল তখন

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। জামিনের চেষ্টা ক'রে কোন ফল নেই তা 'মকদ্দমা সাহেব' ভাল ভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং খুব তাড়া নেই। নির্মলা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল গড়ের মাঠে, তারপর একটা রিক্সা নিয়ে চলল সদ্য-নাম-ঠিকানা-সংগ্রহ-করা এক উকীলের বাড়ি। উকীলটি অপেক্ষাকৃত তরুণ কিন্তু 'মকদ্দমা-সাহেব' বলে দিয়েছেন—খুব খাটিয়ে উকীল, কালে পাইন সাহেবের মতই নাম করবে।

নির্মলার সৌভাগ্যক্রমে তখন অন্য মক্কেল কেউ আসেনি, উকীল-বাবু ধীর ভাবে সব শুনলেন। নির্মলার অপরিসীম শুষ্ক এবং অবসন্ন মুখ দেখে বোধ করি তিনি একটু বিচলিতই হ'লেন। বললেন, 'দেখুন আমার যথাসাধ্য করব কিন্তু বুঝতেই ত পারছেন, এভিডেন্স বড় খারাপ। অন্য কোন বড় উকীল দিতে চান ত বলুন। আমি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে করতে পারি। আমার তাতে কোন অভিমান-বোধ নেই!'

নির্মলা বললে, 'আপনি যতটা পারেন তাই করুন। আমার এমন সঙ্গতি নেই যে বড় উকীলের কাছে যাই। শুধু আপনি আমাকে কথা দিন যে যথাসাধ্য করবেন—আমি তাতেই খুশী।'

বাড়িতে নগদ টাকা যে-কটা ছিল তা প্রায় সবই নির্মলা সঙ্গে করে এনেছিল, তা থেকে পঞ্চাশটি টাকা প্রাথমিক খরচা বাবদ গুণে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে উকীলবাবুও উঠে দাঁড়ালেন।...একবার কেশে গলাটা একটু সাফ্ করে নিয়ে বললেন,...'দেখুন, ডাক্তারের কাছে রোগ গোপন করলে রোগ সারে না। আমার অন্তত সব কথা জানা দরকার। নইলে লড়তে পারব কেন!...আপনি কি বিশ্বাস করেন—আপনার স্বামী নির্দোষ?'

মুহূর্তকাল কি নির্মলা ইতস্তত করেছিল ?

কে জানে। তারপরই সহজ দৃঢ় কণ্ঠে বললে, 'করি বৈকি নইলে মকদ্দমা চালাতে আসতুমই না।'

উকীলবাবু তবু একবার মাথাটা চুলকে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার স্বামীর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আপনার পূর্ণ বিশ্বাস আছে ? অর্থাৎ টাকা খরচের অপর কোন পথ নেই, তা আপনি জানেন ?··· মাপ করবেন—অতর্কিতে কোনো পথ দিয়ে না আক্রমণ আসে, তাই শত্রুপক্ষের সব অস্ত্রের সন্ধান আগে আমাদের নিতে হয়।'

গলায় বেশ জোর দিয়েই নির্মলা বললে, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ রকম কোন আক্রমণই কোথাও দিয়ে আসবে না।'

তাঁকে নমস্কার ক'রে নির্মলা বেরিয়ে এল এবং সোজা বাড়ির পথই ধরলে।

সারাদিনের উপবাস, উদ্বেগ এবং ঘোরাঘুরি। অবসন্ন পা যেন আর চলে না। কোন মতে সে-দুটো টেনে টেনে নিজের ফ্ল্যাটে পৌঁছয় নির্মলা। নিরানন্দ, নির্জন, অন্ধকার ফ্ল্যাট্। অথচ কাল এমন সময় পর্যন্ত তা ছিল ওর সুখের নীড়, নিরাপদ আশ্রয়।

ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বেলেই একটা চেয়ারে যেন এলিয়ে পড়ে। আর কিছুই করতে ইচ্ছা করে না তার। এখন এইভাবে পড়ে থাকতে পেলেই সে খুশী। মেয়েটা হয় ত কাঁদছে, দিদিমাকে জ্বালাতন করছে। হয়ত পেট ভরে খায়নি সে। আর—আর সে, সতীনাথ—সে কী করছে কে জানে। হাজতের অন্ন কি মুখে রুচবে তার ?···হয়ত সে—

কিন্তু এ সব কি ভাবছে সে ?

না, এসব সে ভাববে না। এমন কি, এমন কি শরীরটাকেও সুস্থ রাখতে হবে তার। যুদ্ধই করতে হবে যখন—তখন হাতিয়ার প্রস্তুত থাকা চাই, সেই সঙ্গে যোদ্ধার শরীরও। অকারণে দেহকে পীড়ন ক'রে লাভ নেই।

নির্মলা উঠে বসল। এখন রান্না সম্ভব নয়। খাবার আনাবারও লোক নেই। স্পিরিট ল্যাম্পে জল চড়িয়ে সে বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে এল, মেয়ের টিনের দুধ দিয়ে এক কাপ দুধ ক'রে নিয়ে মেয়েরই জন্য আনা দু'খানা বিস্কুটের সঙ্গে খেয়ে নিলে। তারপর আলমারী থেকে একখানা গহনা বার ক'রে নিয়ে আবার ফ্ল্যাটের বাইরে সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল।

কার কাছে যাবে সে?

এই বাড়ির বাকি ফ্ল্যাটে যে বাঙ্গালীরা থাকেন তাদের সকলকার কথাই একবার ক'রে ভেবে নিলে সে। কিন্তু কারুর কাছেই যেতে ইচ্ছা করল না। একেবারে ওপরে থাকেন এক মারাঠী ভদ্রলোক, শেষ পর্যন্ত তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়েই সে কড়া নাড়লে।

অত রাত্রে ওকে দেখে মহিলাটি খুব অবাক হয়ে গেলেন। বিশেষত ওর ঐ চেহারা দেখে আরও উদ্বেগ বোধ করলেন। দুই হাত ধরে একেবারে একটা চেয়ারে এনে বসিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার দিদি—এত রাত্রে, এমন ভাবে? কোন বিপদ হয়েছে কি?'

মারাঠী ভদ্রলোকটি নিজেও ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর দিকে চেয়ে নির্মলা মাথা নিচু ক'রে বললে, 'এমন বিপদ যেন অতি বড় শত্রুরও না হয় ভাই! আমার আর কেউ নেই, উনি আমার বড় ভাইয়ের মত—তাই ওঁর কাছেই ছুটে এসেছি।'

মারাঠী ভদ্রলোকটি বেশ পরিষ্কার বাংলা বলেন। তিনি কোমল কণ্ঠে বললেন, 'কী হয়েছে বল বোন্‌টি, আমার যা করবার তা নিশ্চয়ই করব—যথাসাধ্য!'

নির্মলা সব খুলে বললে। তারপর আঁচল থেকে হারটা খুলে ওঁর হাতে দিয়ে বললে, 'এটা বিক্রী ক'রে আমাকে টাকা এনে দিতে হবে। আমি মেয়েছেলে—হিসেব বুঝতে পারব না,—আমাকে ঠকাবে।'...

ভদ্রলোক বিষম বিচলিত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'কিন্তু এখনই বিক্রী করবে? না হয়—এখন কিছু টাকা আমার কাছ থেকে ধারই নাও না কেন?'

'না, আপনি দয়া ক'রে বিক্রী করারই চেষ্টা করুন।'

সে হারটি ওঁদের টেবিলে রেখে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে এল।

পরের দিন নির্মলা আর একটি অদ্ভুত কাণ্ড ক'রে বসল। কলেজ স্ট্রীটের এক বইয়ের দোকান থেকে একখানা ক্রিমিন্যাল আইনের বই কিনে নিয়ে এল। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা ক'রে বেশী দাম দিয়ে সব চেয়ে প্রামাণ্য বইখানাই সংগ্রহ করলে সে।

এর পর শুরু হ'ল ওর তপস্যা।

বিদ্যা সামান্য। ম্যাট্রিক পাসের বিদ্যাতে এমনিই কিছু শেখা যায় না—তার ওপর এতদিনের ব্যবধানে সব কিছুই প্রায় ভুলে গিয়েছে। এই অত্যল্প বিদ্যায় আর যাই হোক্‌, আইনের বই পড়ে আইন বোঝবার চেষ্টা করা চলে না। সেটা অবিশ্বাস্য ত বটেই—বোধ হয় অসম্ভবও।

নির্মলা কিন্তু সেই দুঃসাধ্য-সাধন-ব্রতেই প্রয়াসী হ'ল। দিনরাত বইখানা খুলে ঝুঁকে বসে পড়ে। অভিধান খুলে মানে বোঝবার চেষ্টা করে। শব্দার্থ বুঝলেও গূঢ়ার্থ বোঝা যায় না। ভাষার গহন অরণ্যে বুদ্ধি পথ হারায়। এ জটিলতার জাল কেটে ভেতরে প্রবেশ করা বুঝি মানুষের অসাধ্য। এক এক সময় একেবারেই হতাশ হয়ে পড়ে। বই মুড়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়—রাস্তায় যানবাহন ও লোক-চলাচল দেখে শূন্য দৃষ্টি মেলে। আবার এসে বসে বই খোলে।

হার সে মানবে না—কিছুতেই।

অবশেষে বহু চেষ্টা করতে করতে এক সময় মনে হ'ল অন্ধকার কিছু ঝাপসা হচ্ছে। বোপদেবের গল্পের মাটির কলসীর মত নিয়ত সংঘর্ষে পাথরেও দাগ পড়ল। নির্মলার কাছে দুরূহ এবং দুর্বোধ্য ভাষার কুয়াশা সরে গিয়ে আইনের সহজ রূপটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে এবার ভাবতে শুরু করে—এর কোন্ রন্ধ্র পথে সে বার ক'রে আনবে সতীনাথকে!

অবশেষে একসময় মকদ্দমা শুরু হয়। নির্মলা মাথার ওপর সামান্য কাপড় তুলে দিয়ে মোটা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে উকীলের পাশে এসে বসে। এ পর্যন্ত সবই স্বাভাবিক—কিন্তু উকীলবাবু চমকে উঠলেন সওয়াল-জবাব শুরু হ'তে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আইনের প্যাঁচগুলো যখন নির্মলাই বলে দিতে লাগল—জেরার অর্ধেক জবান নিজে লিখে উকীলের চোখের কাছে ধরতে লাগল।

পুলিশ আগে ছিল নিশ্চিন্ত। ক্রমশ আসামী পক্ষের সওয়ালে প্রথমে বিপন্ন, পরে উদ্বিগ্ন—শেষ অবধি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তারাও

প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল আসামীর যাতে সাজা হয়ে যায়।

কিন্তু তা হ'ল না।

প্রমাণ হয়ে গেল যে নোটের বাণ্ডিলগুলো নিয়ে যাবার সময় সতীনাথের টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে ক্যাশিয়ার বাবুর হাত থেকে দুটো বাণ্ডিল পড়ে গিয়েছিল।...সতীনাথই উঠে এসে কুড়িয়ে দেয়। সুতরাং তার আঙ্গুলের ছাপ থাকাটা অসম্ভব নয়। আলমারীর হাতলে ছাপ ছিল কিনা—পুলিশ তা দেখেনি।..নোটের বাণ্ডিলে আঙ্গুলের ছাপ দেখেই উল্লসিত হয়েছিল, হাতলের ফটো নেবার কথা মনে পড়েনি।...দুটো মাত্র বাণ্ডিলেই সতীনাথের হাতের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল—সুতরাং ও প্রমাণটার খুব জোর রইল না।

দারোয়ান রামনন্দন বড়সাহেব যাওয়ার পর সারাক্ষণই ঘরের বাইরে টুলে বসেছিল, সে ভেতরে কিছু দেখেনি বটে তেমনি সতীনাথের চেয়ার ছেড়ে ওঠবার আওয়াজও পায়নি। অন্তত হলফ্ ক'রে বলতে পারে না যে পেয়েছে। বামাল ধরা পড়েনি—কারণ কোনটাই নম্বরী নোট নয়, কেউ তার নম্বর লিখে রাখার চেষ্টাও করেনি। পুলিশ লক্ষ লক্ষ সাধারণ নোটের সমুদ্র থেকে একবিন্দু জলকণার মত ঐ সামান্য ক'খানা নোট উদ্ধারের কোন চেষ্টাও করেনি।

সুতরাং পুলিশের কেস শেষ অবধি টি ঁকল না। সতীনাথ সসম্মানে মুক্তি পেলে এবং পাল্‌টা মকদ্দমার ভয় দেখিয়ে চাকরীটাও বজায় রাখা হ'ল। এ বুদ্ধিও নির্মলার—সে বললে এখানেই চাকরীতে বহাল না হ'লে অন্যত্র কাজ পাওয়া শক্ত হবে। বরং কয়েক মাস এখানে করার পর ছেড়ে অপর জায়গায় চেষ্টা করলেই হবে।

এই অব্যাহতি বা সাফল্যের পনেরো আনা কৃতিত্বই নির্মলার। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন। বাড়ির

অপর ফ্ল্যাটের অধিবাসীরা চাঁদা তুলে একটি গহনা উপহার দিয়ে গেল। অভিনন্দন ও অভিবাদনের ঝড় বয়ে গেল যেন ক'দিন ধরে।

সতীনাথের ত কথাই নেই।···প্রথম নির্জন দর্শনে তার কৃতজ্ঞতা আর বাধা মানল না, অজস্র অশ্রুর আকারে ঝরে পড়তে লাগল আলিঙ্গনাবদ্ধ স্ত্রীর মাথার ওপর।···গর্বই কি কম? সে প্রকাশ্যেই তার এই দুর্ঘটনার জন্য আনন্দ প্রকাশ ক'রে বেড়াতে লাগল। নির্মলা যে এমন, নির্মলা যে তাকে এত ভালবাসে—এই বিপদে না পড়লে ত কোনদিনই সে বুঝতে পারত না। এই অসাধারণ প্রেম উপলব্ধি করার জন্য পুরুষ যে কোন বিপদেই পড়তে রাজী আছে।

গর্ব আর আনন্দ নির্মলারও কম হয়নি। সকলের স্তুতি ও প্রশংসা —স্বামীর পুরুষ বন্ধুদের ঈর্ষাতুর চাহনি যেন নেশার মত তাকে একই সঙ্গে উত্তেজিত ও অভিভূত ক'রে তুললে। সে সেই মাদক রস চুমুকে চুমুকে পান করতে লাগল বেশ উপলব্ধি করতে করতে।···সুখে ও আনন্দে মশ্‌গুল হয়ে উঠল ওদের ছোট সংসার।···

অবশেষে একদিন সে ঝড়ের উদ্দামতা কমে এল—শান্ত হ'ল চারিদিকের আব্‌হাওয়া, আবার পূর্বের মত সহজ, স্বাভাবিক এবং উত্তেজনাহীন জীবনযাত্রা শুরু হ'ল। তিনটি প্রাণীর ছোট্ট সংসারের সামান্য ও সাধারণ জীবনযাত্রা···

ঠিক কি সবই আগের মত চলতে লাগল?···বাহ্যত তাই বটে। কিন্তু নির্মলা ও সতীনাথ অনুভব করে কোথায় যেন সুর কেটেছে। সতীনাথের কৃতজ্ঞতা আজও কমেনি—নির্মলার ব্যবহারে মনের মধ্যে সংশয়ের আভাস পেলেই সে জোর ক'রে স্ত্রীর কৃতিত্বের কথাটা স্মরণ

করবার চেষ্টা করে। যেন বার বার জপ করে সে স্ত্রীর নাম।

তবু—

তবু কোথায় কী একটা গোলমাল থেকে যায়। দৈনন্দিন জীবনের সহজ অন্তরঙ্গতার ভেতর কোথায় যেন একটা পাঁচিল উঠেছে। খুবই সূক্ষ্ম হয়ত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যাকে বলেছেন প্রদীপের শিখার কিছুটা লাল ও কিছুটা শ্বেত অংশের ভেতর সামান্য ছায়ারেখার ব্যবধান—হয়ত তাই। তবু উঠেছে। আর তার অস্তিত্ব অস্বীকার করবারও উপায় নেই। ক্রমে ক্রমে তা প্রতিষ্ঠিতই হচ্ছে।

হয়ত এতটা মনে হ'ত না, যদি না সতীনাথ অফিসেও একটা চাপা অবিশ্বাস অনুভব করত। সবাই কথা কয়—কিন্তু কাজের কথা। হয়ত বন্ধুরা কেউ কেউ ঠাট্টাতামাসাও করে, এবং একেবারে যে তাতে অন্তরঙ্গতার অভাব ঘটে তাও না, তবু সবটা যে ঠিক আগের মত নেই তা সতীনাথ বেশ বুঝতে পারে। সে টের পায় যে সে পেছন ফিরলেই বহু জিজ্ঞাসা ও সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তার দিকে নিঃশব্দে চেয়ে থাকে। চোখে চোখে একটা প্রশ্ন বিনিময় হয়ে যায়।

এক এক সময় সতীনাথ মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে যে ওর অফিসের এই অভিজ্ঞতাই নির্মলা সম্বন্ধে এমনি একটা ধারণা গড়ে তুলেছে মনের মধ্যে।···এ ওর বুঝি একটা ম্যানিয়া।

এই অনুভূতির সময়গুলোতে তাই সে মধ্যে মধ্যে হঠাৎ উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে বসে। স্ত্রীর সঙ্গে একটু মাত্রা-অতিরিক্ত ভাবেই চপলতা করতে যায়।

কিন্তু মাত্রা-অতিরিক্ত বলেই বুঝি তা সহজ ও স্বাভাবিক হয় না।

নির্মলাও প্রথম প্রথম মনে মনেই প্রবল ভাবে মাথা নাড়ে।

না-না—। স্বামীকে সে কোন দিন অবিশ্বাস করেনি, আজও করে না।

ভূতকে যে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে সে-ই অবিশ্বাসের কথাটা প্রবল-কণ্ঠে ঘোষণা করে। আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা অনুপস্থিত উপস্থিতি যেন অনুভব করে তার আশেপাশে।

নির্মলাও তেমনি একটা ভূতের ভয় অনুভব করে। সে ভূত নেই, তার কোন অস্তিত্ব কোথাও প্রকাশ পায়নি—তবু নিজের ভেতরই তার উপস্থিতিটা টের পায় যেন।...

অবশেষে আর চাপা থাকে না। এক সময় সেই দেহহীন ছায়াহীন ভূতের ভয়টাই প্রবল হয়ে ওঠে।

শুকিয়ে আসে ওদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে উচ্ছলতার রস। কথা বলে ঠিকই—কিন্তু কেউ কারুর দিকে চায় না চোখ তুলে, পাছে চোখে চোখ পড়ে এবং তাতে ক'রে মনের কথা প্রকাশ পায়।

সহজ সুরও যেন বাজে না কণ্ঠে।...ক্রমশ আচরণে প্রকাশ পায় কুণ্ঠা।...

ভাগ্যিস্ পাশাপাশি শোয় না তারা, মধ্যে খুকীটা থাকে। তা না হ'লে ওরা যে বহু রাত্রি পর্যন্ত বিনিদ্র থাকছে, সে তথ্যটা না-জানার অভিনয় আর কত দিন চালানো যেত?

তবু শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারে না নির্মলা। যে স্বামীকে সে ভালবাসত একদা সারা মন প্রাণ দিয়ে, সেই স্বামীকে ফিরে পেতে চায় সে।

একদিন রাত্রে হঠাৎ তাই বিছানায় উঠে বসে সে বলে, 'হ্যাঁগো, তুমি জেগে আছ?'

'আছি, কেন বলোত?' বিস্ময় প্রকাশ করে, প্রশ্নও করে—কিন্তু গলার কম্পনে ধরা পড়ে যে সতীনাথ উত্তরটা অনুমান করেছে।

নির্মলা একটুখানি ইতস্তত ক'রে প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, তুমি আমার অপরাধ নিও না—ঐ টাকাটা সত্যিই কি তুমি নাও নি?'

এতদিনের সমস্ত ক্ষোভ সতীনাথের গলার ভেতর দিয়ে যেন একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায়। সে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'তুমিও কি ওদের মত মনে মনে আমাকে সন্দেহ করো, নির্মল?...তাহ'লে কেন আমাকে বাঁচাতে গেলে এত কাণ্ড ক'রে?...আইনের হাতে ছেড়ে দিলেই পারতে!'

অনুতপ্ত কণ্ঠে তাড়াতাড়ি উত্তর দেয় নির্মলা, 'আমাকে মাপ করো। আর কখনও এমন কথা তুলব না!'

কিন্তু তবু...যত দিন যায়, মনের মধ্যে এ কথাটা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না নির্মলা যে, যে-উত্তরটা সে শুনতে চেয়েছিল সে উত্তর দেয়নি সতীনাথ। হয়ত ওর কথার মধ্যেই সেটা প্রকাশ করতে চেয়েছে, অনাবশ্যক বোধে আর বেশী কিছু বলেনি। কিংবা হয়ত—ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছে সে।...কে জানে!

অপবাদ

য়্যাটর্নী প্রতাপবাবু অনেকক্ষণ নিঃশব্দে রমেনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সামান্য একটু হাসলেন। সে হাসি য়্যাটর্ণীরই হাসি—অর্থাৎ ঠোঁটের দুটি কোণ একটু খানি মাত্র বিস্তারিত হ'ল—তবু তাতে স্নেহের ও বিবেচনার অভাব ছিল না। তারপর একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, 'তুমি এখন বরং বাড়ি যাও, সব কথাটা ভাল ক'রে ভেবে দেখে কাল আমাকে জানিও।'

রমেন লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। সত্যিই—ব্যস্ত য়্যাটর্ণীর খাসকামরাটা বসে দিবাস্বপ্ন দেখার জায়গা নয়—বিশেষত এই কাজের সময়। সে কোনমতে অস্ফুট একটা বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তার অন্যায় হয়ে গেছে এতক্ষণ থাকাটাই—বাইরে আরও বহু মক্কেল বসে অপেক্ষা করছেন—তাঁরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন!

বাইরে অধিকাংশ কেরাণীই তখন কাজে ব্যস্ত—কিন্তু অল্প দু-চার-জন পান-খাওয়া-দাঁত খুঁটতে খুঁটতে চাপাগলায় খোস-গল্প করছিল, দোর খোলার শব্দে একবার চেয়ে দেখলে। রমেনের মনে হ'ল—সেদিকে না তাকিয়েই যে—ওরা মুচকি হাসছে ওকে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ-চোখ রাঙ্গা হয়ে উঠল, দুটো কান দিয়ে যেন আগুন বেরোতে লাগল। হয়ত ওর কথা কেউই জানে না, প্রতাপবাবু নিশ্চয়ই অকারণে নিজের কেরাণীদের কাছে ওর কথা গল্প করতে যান নি—এ সবই রমেন জানে, তবু যেন এ লজ্জা ঢাকবার ঠাঁই থাকে না ওর।

হাইকোর্টের পাড়া—সর্বত্র যেন একটা অনাত্মীয়তার ভাব, কোথাও কোন আশ্রয় বা প্রশ্রয় নেই। এখানে এলেই খারাপ লাগে। শুধু কাজ, ব্যবসায়—শুধুই টাকা-আনা-পাইয়ের গন্ধ এখানের বাতাসে। কেউ কারুর আপন নয়, কারুর জন্য কারুরই অন্তরের টান নেই—সেটা যেন এখানকার সর্বত্র পরিষ্কার অক্ষরে লেখা আছে। এই আব্‌হাওয়াতে ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে একটুখানি থাকলেই। কে যেন গলা টিপে ধরে ওর।

বেশ একটু জোরে জোরে হেঁটে গিয়ে গঙ্গার ধারে পড়ল রমেন। গাড়ি আজ আনে নি ইচ্ছে ক'রেই, মানসিক যা অবস্থা তাতে মাথা ঠাণ্ডা করে কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চালানো শক্ত। গাড়ি থাকলেও হাঁটার অভ্যাস একেবারে যায় নি তার, এখনও প্রয়োজন হ'লে মাইল দু-তিন অনায়াসে হেঁটে যেতে পারে।

কিন্তু অনন্তকাল ধরে হাঁটলে চলবে না। বাইরে ও যত জোরে হাঁটছে, মনের মধ্যে হাঁটছে তার চেয়ে ঢের বেশি জোরে জোরে। সে বেগকে সংহত করা দরকার। একটু কোথাও স্থির হয়ে বসে মনের ভাবনাটাকে গুছিয়ে নিতে না পারলে পাগল হয়ে যাবে সে।

'বুফে'তেই গিয়ে বসবে নাকি শেষ পর্যন্ত ? স্টীমার ঘাটের ওপরে ঐ দোতলা রেস্তোরাঁটায় ? মীনুর সঙ্গেই শেষ এসেছিল ও এখানে বছর দুই আগে। আজ আবার ওখানেই ? কিন্তু আপত্তিই বা কি ? মীনুর সম্বন্ধেই ত আজ ও ভাবতে চায়—বরং বলা যেতে পারে শেষ ভাবা ভাবতে চায়। যেখানে বসে সেটা ভাববে, থাক না তার চার পাশে মীনুর স্মৃতির একটু আভাস ছড়িয়ে।

শেষ পর্যন্ত সিঁড়ি বেয়ে 'বুফে'তেই উঠে গেল রমেন।

তখনও ভীড় শুরু হয় নি। 'বুফে'র আর সে গৌরব নেইও।

ক্ষীণকটি নীলাক্ষী মেমদের স্থান অধিকার করেছেন স্থূলকটি মারোয়াড়ী মহিলাদের দল। লোক আসেও কম—হয়ত এটা একদিন উঠিয়েই দিতে হবে। যাক,—আজ কিন্তু ভীড় না থাকার জন্যই রমেন কৃতজ্ঞ হয় মনে মনে।

শেষ যেদিন মীনাক্ষীকে নিয়ে এসেছিল সে, সেদিনও এমনি অপরাহ্ণ। মীনুই বলেছিল, 'একটু সকাল ক'রে চলো বাপু যেতে হয়ত—যা ভীড় হয় ওখানে সন্ধ্যের সময়।'

সকাল করেই এসেছিল ওরা। সেও এমনি চারটের সময়। ঐ ওধারের টেবিলটায় বসেছিল, একেবারে ঐ অপর-প্রান্তে।

সামনাসামনি না বসে ওরা পাশাপাশি বসেছিল, অর্থাৎ যতটা পাশাপাশি বসা যায়। একজন বসেছিল গঙ্গার দিকে পাশ ফিরে আর একজন বসেছিল সামনে ফিরে। একটা হাত বাড়িয়ে মীনু ওর ডান হাতখানা চেপে ধরে বলেছিল, 'দ্যাখো—আজ এই বেলাবেলি আসার জন্যেই বোধ হয়—আমার খুব ভাল লাগছে জায়গাটা। যদি এর পর কোন দিন অন্য কাউকে নিয়ে এখানে এসো—মানে অন্য কোন মেয়েকে নিয়ে, তাহলে যেন এখানে ব'সো না। এই জায়গাটা—এই টেবিলটা থাক্ আমাদেরই প্রেমের স্মৃতি জড়ানো।'

একটু অবাকই হয়েছিল রমেন। ওর মনে তখন মীনাক্ষী ছাড়া আর কারুর স্থান কল্পনাও করতে পারে না।

'হঠাৎ একথা কেন মীনু।'

'না—এমনিই মনে হ'ল।'

'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না মীনু?'

'না, তোমাকে ভয় করি আমি। যে উদ্দাম প্রেম তোমার আমাকে এমনভাবে অভিভূত আচ্ছন্ন করেছে তা কখনও চিরস্থায়ী হতে পারে

না। বন্যার জল তো বেশিদিন থাকে না!'

সেদিন রমেন ক্ষুণ্নই হয়েছিল মনে মনে। তার কারণ সে নিজেকে চিনতে পারেনি সেদিন—তার চেয়ে তাকে চিনেছিল মীনাক্ষীই বেশি।

নইলে—সে তো এই মাত্র দু'বছরের ঘটনা—সেদিন যেটা একেবারেই অসম্ভব মনে হয়েছিল, আজ সেটাই সম্ভব হ'ল কি করে? অথচ সত্যিই রমেনের মনে তো একটুও সংশয় জাগেনি।

কিন্তু জাগাই উচিত ছিল। আজ রমেন এ কথা অন্তত মানতে বাধ্য।

প্রেমে তো সে প্রথমটা মীনাক্ষীর পড়েনি।

মীনাক্ষীর দিদি মঞ্জরী ছিল ওর ক্লাসফ্রেণ্ড। শুধু এম-এ ক্লাসে নয়, তারও আগে থেকে।

ওরা দুজনে আই-এ পড়েছিল একত্রে। বি-এও পড়েছিল।

কিন্তু তখন রমেন কোনদিন ওর দিকে বা ওদের দিকে চেয়েও দেখেনি। ও তখন রীতিমত নারী-বিদ্বেষী বলে নিজেকে প্রচার করত। ঐটেই ছিল ওর গৌরব। ও আর পাঁচজন ছেলের থেকে পৃথক—একটু অন্য ধরণের, এইটে প্রমাণ করতে ও ছিল উৎসুক। তা ছাড়া একটা আলাদা বেঞ্চে ওরা চার-পাঁচজন এক সঙ্গে বসত, এদের সঙ্গে যোগাযোগও ছিল কম। তবু কি আর কেউ গায়ে পড়ে আলাপ করেনি, তা করেছে, করিডোরে সিঁড়িতে ফিস্‌ফিস্ আলাপ হাসিঠাট্টাও চোখে পড়েছে কিন্তু রমেন সে দলে মেশেনি কোনদিন। বরং এই চার-পাঁচটি মেয়ের ভাবভঙ্গী ওর কাছে অদ্ভুত, হাস্যকরই মনে হয়েছে চিরদিন। অধ্যাপকদের প্রশ্নের উত্তরে ওদের বোকার মত কথা বলা—

চাল-চলনে এদের সম্বন্ধে নিস্পৃহ থাকার প্রাণপণ ব্যর্থ প্রয়াস—দেখলে মধ্যে মধ্যে হাসি চাপা কঠিন হয়ে পড়ত ওর। দু-এক ক্ষেত্রে বেশ জোরেই হেসে ফেলেছে।

হঠাৎ এই মঞ্জরী মেয়েটিই একদিন যেচে আলাপ করেছিল।

বি-এ পরীক্ষার টাকা জমা দিয়ে কলেজ থেকে বেরোচ্ছে—গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল মঞ্জরী। তখন বেলা দুটো—গেটের কাছে আর কেউই নেই। রমেন চলেই যাচ্ছিল কিন্তু মঞ্জরী এসে প্রায় পথ রোধ করে দাঁড়াল।

রমেন একটু বিব্রত, একটু বিরক্ত হয়েই মুখ তুলে তাকালে।

'দেখুন, একটা কথা বলব ?'

'বলুন।'—ভ্রূ তখনও কুঁচকেই আছে রমেনের।

'আমরা চার বছর একসঙ্গে পড়লাম ; প্রায় পাশাপাশি বসলাম—কিন্তু পরিচয় পর্যন্ত হ'ল না। আপনার ঐ বেঞ্চের দলটাই আমাদের ওপর যেন বিরূপ। তবু অন্যরা দু'একদিন দরকারেও দু' একটা কথা বলেছে কিন্তু আপনি কোনদিন একটা কথা বলেন নি।···কেন বলুন তো ? কি অপরাধ করেছি আমি—আমরা ?'

এবার রীতিমত বিব্রত হ'ল রমেন।

'না, না—ছি, এসব কি বলছেন।'

'তবে—?'

'মানে—এই তেমন কোন অকেশ্যন তো হয়নি।'

'অকেশ্যন্ অনেক হয়েছে কিন্তু আপনি এড়িয়ে গেছেন। দেখুন এই কলেজের পড়া শেষ হয়ে গেল—এবার কে কোনদিকে ছিটকে পড়ব তা কেউ বলতে পারে না। চার বছরের সহপাঠী আমরা—ভবিষ্যৎ জীবনে দেখা হ'লে কেউ কারুর নামটা পর্যন্ত বলতে পারব না। এটা কত

বড় দুঃখের কথা বলুন তো।'

রমেন ততক্ষণে ঘেমে উঠেছে। ওর সুগৌর মসৃণ ললাট যে ক্ষণে ক্ষণে রক্তাভামণ্ডিত হয়ে উঠছে তা তার স্বেদবিন্দুর মধ্যে দিয়েও দেখা যায়। মঞ্জরীর দুঃখ আন্তরিক সন্দেহ নেই—তবু ওর এই বিব্রত অবস্থায় তার ঠোঁটের কোণে একটু চাপা হাসিই ফুটে উঠল।

অধ্যাপকরা রমেনকে ভাল ছেলে ব'লে জানেন। সে মেয়েদের সঙ্গে গায়ে পড়ে মেশেনা বলে তাঁরা খুশি। বিশেষত শিশির বাবু খুব প্রশংসা করেন ওর। এখন এই নির্জন দ্বিপ্রহরে এমন নিভৃত জায়গায় ওদের দেখলে কি ভাববেন—মনে করেই রমেন আরও ঘেমে উঠল। ওর মনে হতে লাগল তাঁদের অদৃশ্য চক্ষু উপহাস ও অবজ্ঞার দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে পেছন থেকে।

শার্টের কলারটা অকারণে টানাটানি করতে করতে রমেন বার-দুই ঢোঁক গিলে বললে, 'চলুন না—আজই আলাপটা করা যাক।'

কলেজ থেকে বেরোতে পারলে সে বাঁচে।

'বেশ তো। চলুন কফি হাউসে যাই'—সহজভাবেই বললে মঞ্জরী।

'না, না—কফি হাউস না। বড্ড ভীড়।'

সেখানেও অধ্যাপকরা গিয়ে থাকেন। সহপাঠীদের তো কথাই নেই। আজকের আনন্দের দিনে ঐখানেই সকলে সমবেত হবে। তারপর কথাটা শিশিরবাবুদের কানে উঠতে কতক্ষণ ?

'চলুন গঙ্গার ধারে গিয়ে কোথাও বসা যাক।'

'চলুন, সে ত ভাল কথাই।' তারপর মুখ টিপে হেসে বলেছিল, 'পাঁচজনের সামনে আমাদের সঙ্গে কথা কইতে লজ্জা করে বোধ হয় আপনার—না ?'

'কী যে বলেন আপনি। যা তা !'

সেদিনও এই বুফেতেই এসে বসেছিল ওরা।

'মঞ্জরী দে আমার নাম।' চেয়ারে বসতে বসতে মঞ্জরী বলেছিল।

'আমার নাম রমেন চক্রবর্তী।'

'তা জানি। আপনি আমাদের খবর রাখেন না—কিন্তু আমি রাখি। ভাল ছেলেদের সব ক'জনকেই চিনি আমরা।'

'ভাল ছেলে!'

'আর বিনয় করছেন কেন! ভাল ছেলে এই অহঙ্কারেই তো আপনারা আমাদের পোকা-মাকড়ের সামিল ভাবেন। না হয় আমরা চেষ্টা করেও আপনাদের মত নম্বর পাই না। তাই বলে—'

শেষের দিকে কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এসেছিল মঞ্জরীর।

পরিচয় থেকে আলাপ। তা থেকে খোসগল্প। চা খাওয়া—গঙ্গার জলের দিকে চেয়ে চেয়ে।

ওখান থেকে বেরিয়ে মঞ্জরীকে পৌঁছে দিয়ে গেল রমেন। তু' মিনিটের জন্যে ভেতরে বসতেও হ'ল। তখন মঞ্জরীর বাবা বাড়ি ছিলেন না। মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে মঞ্জরী। মোটাসোটা ভালমানুষ লোক। তিনি বললেন, 'বেশ ত। এসো না বাবা মধ্যে মধ্যে। মেয়েটা কেমন লেখাপড়া করছে একটু নজর রাখতেও পারো।'

রমেন ভালমানুষের মত ঘাড় কাৎ ক'রে সম্মতি জানালে, 'আসব বৈ কি! এখন ত আর—চেনাশুনো যখন হয়েই গেল—'

পালাতে পারলে সে বাঁচে তখন কোনমতে।

বলাবাহুল্য এ প্রতিশ্রুতি সে রাখে নি। তবে পরীক্ষার সময় দেখা হয়েছিল তু'একদিন—তখন সহজভাবেই কথা বলেছিল সে। মঞ্জরী অনুযোগ করে বলেছিল, 'বেশ লোক ত আপনি! মাকে কথা দিয়ে

এলেন যাবেন।...আমার পড়াশুনোর তদ্বির তদারক করবেন—'

'একদম সময় পাই নি। বিশ্বাস করুন। পড়াশুনো আমার নিজেরই হয় নি বলতে গেলে—'

'আমি অবিশ্যি আশাও করি নি আপনাকে। রেকগ্‌নাইজ করেছেন এই আমার ভাগ্যি!'

'কী যে বলেন!'

পরিচয়টা সেই মুখ-চেনাতেই থেকে যেত যদি না হঠাৎ ফিফ্‌থ্‌ ইয়ারে পড়তে এসে রমেন আবিষ্কার করত যে মঞ্জরীও এসে ভর্তি হয়েছে।

'ও! আপনিও এখানে!' বলে উঠেছিল রমেন।

'হ্যাঁ। আপদ এখানেও এসে জুটেছে। আপনি আশা করেন নি যে আমি 'ডি' পাবো—না? কি করবো বলুন, হয়ে গেল। আপনার দুর্ভাগ্য!'

'কী সব যে আপনি বলেন যা তা।...আমাকে কি ভাবেন বলুন তো!'

'ঠিকই ভাবি মশাই!' তারপর আর একটু কাছে সরে এসে বললে, 'এই তিনটি মাস আমি তপস্যা করেছি শুধু—ডিস্টিংগুয়ান পাবার জন্যে। এমন প্রাণপণে আর কখনও পড়িনি। ভয় ছিল পাছে ভর্তি হ'তে না পারি।'

'সে ত আনন্দের কথা। আপনার তো বরাবরই লেখাপড়ায় উৎসাহ। এম-এ না পড়লে দুঃখের কথা হ'ত!'

'আপনারও দুঃখ হ'ত কি? আমার কথা কি মনেও হত একবার, এখানে দেখা না হ'লে?'

'কি যে বলেন!' বোকার মত একটা কথারই পুনরুক্তি করে রমেন।

এর পর কিন্তু ঘনিষ্ঠতাটা এড়াতে পারে নি রমেন।

বাড়িতে যাওয়া শুরু হ'ল। মঞ্জরীর বাবা মা ভাই বোনদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। এই মীনাক্ষীর সঙ্গেও তখন পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু মীনাক্ষীর দিকে একবারের বেশি চেয়ে দেখবার কথাও মনে পড়ে নি। কেমন একটা রোগা রোগা ফ্যাকাশে ধরণের চেহারা ছিল ওর। যেমন শ্রীহীন, তেমনি নির্জীব!

মঞ্জরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়লেও প্রথমটা সেটুকু বন্ধু-প্রীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তার চেয়ে বেশি কিছু আশা করে নি রমেন। কিন্তু সিক্‌স্‌থ্‌ ইয়ারে উঠে ছুটির দিনে দুজনে এক সঙ্গে পড়ার ব্যবস্থা হ'তে রঙটার একটু বদল হ'ল। প্রথম রমেনের মনে হ'ল মঞ্জরী মেয়েটির মধ্যে মুগ্ধ হবার মত অনেক গুণ বা চার্মিং কোয়ালিটিজ্‌ আছে। অন্তরটা ওর খুবই ভাল। বাইরের চেহারাটাও মন্দ নয়। লেখা পড়ায় মন আছে। বুদ্ধি আছে। সরস ক'রে কথা কইতে পারে। হাসলে ভারি সুন্দর দেখায় ওকে। আর হাসতে জানেও। ইত্যাদি—

এর পর কয়েকটি ঘটনা একটু দ্রুতই ঘটেছিল ওর জীবনে।

মা মারা গিয়েছিলেন শৈশবে—এম-এ পরীক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ বাবাও মারা গেলেন। সেই দুর্দিনে যে সমবেদনা প্রকাশ পেয়েছিল মঞ্জরীর মধ্যে, যে ভাবে মূর্তিমতী সান্ত্বনার মত পাশে এসে সে দাঁড়িয়েছিল—তা স্মরণীয়।···সেই সময়েই রমেন প্রথম অনুভব করলে যে মঞ্জরী ছাড়া ওর জীবন সম্ভব নয়!

এর পর কোন পক্ষের মনোভাবই কোন পক্ষের কাছে গোপন থাকে না। গোপন রাখার প্রয়োজনও হয় না। মঞ্জরী বলে, 'যে দিন থেকে দেখেছি আমাদের সম্বন্ধে তোমার অসীম অবহেলা—সেদিন

থেকেই আমার পণ, তোমাকে আমি জয় করবই। তারপর নিজেই কিন্তু প্রেমে পড়ে গেলুম।···সমস্ত থার্ড ইয়ার আর ফোর্থ ইয়ারটা তোমাকে নিঃশব্দে পূজো করেছি মনে মনে—! উঃ, সে কি দিনই গিয়েছে। কোনদিন যে তোমাকে পাবো এ আশাই ছিল না।'

পাওয়াতে কোন বাধা ছিল না বলেই বোধ হয় কোন পক্ষে কোন তাড়া ছিল না। এক সময়ে মঞ্জরীর বাবা মার কাছে কথাটা পাড়লেই চলবে—এই মনোভাব ছিল রমেনের। হঠাৎ একদিন বহুবার দেখা মীনাক্ষী নতুন করে ওর চোখে পড়ল। সেদিনটা ছিল বুঝি মীনাক্ষীর জন্মদিন—ওর মা দিয়েছিলেন ওকে সাজিয়ে। নতুন ভঙ্গীতে কেশ-সজ্জা করে তাতে জড়িয়ে দিয়েছিলেন বকুলের মালা। ললাটে ছিল কয়েকটি সূক্ষ্ম চন্দনের ফোঁটা, তার মধ্যে মধ্যে ছিল স্বেদবিন্দুর ইঙ্গিত।

সমস্ত মুখে ছিল একটি লজ্জা-রক্তিমা। বেশভূষায় প্রসাধনে—সবটা মিলিয়ে যেন অপরূপ হয়ে উঠেছিল মীনাক্ষী।

চমকে উঠেছিল রমেন।

সত্যিই চমক লেগেছিল ওর।···প্রথমটা যেন কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এই সেই মীনাক্ষী? মীনু?

আশ্চর্য! ওর এই অবর্ণনীয় লাবণ্য আর পরিপূর্ণ যৌবন এতকাল ছিল কোথায়?

আসলে মঞ্জরীকে নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিল রমেন যে এই দীর্ঘকাল ভাল ক'রে মীনাক্ষীর দিকে তাকাবার অবসর পায় নি। ইচ্ছাও ছিল না। কেমন একটা অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের ভাবই ছিল মনে মনে। তাই কবে যে ওর সেই শীর্ণ দেহ এমন পুষ্পিত যৌবনে নিটোল হয়ে উঠেছে,

ওর সেই ফ্যাকাশে রঙে এসেছে স্বাস্থ্যের রক্তাভা—তা বুঝতেও পারেনি…

অভিভূতের মত, আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে রইল রমেন। মীনাক্ষী ওর অভিভূত অবস্থাটা কিছুক্ষণ সকৌতুকে অনুভব ক'রে ওকে প্রণাম ক'রে উঠে বললে, 'কৈ আমাকে আশীর্বাদ করলেন না রমেন দা?'

'আশীর্বাদ!…ও, এই যে! হ্যাঁ করেছি বৈ কি!'

বোনের দিকে চেয়ে মঞ্জরী একটু গর্বিতই বোধ করছিল। সস্মিত মুখে ওকে জিজ্ঞাস করলে, 'বেশ দেখাচ্ছে মীনুকে, না?'

'হ্যাঁ। লাভ্‌লি!' রুদ্ধ নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বললে রমেন।

তার পর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল ওলট পালট। বহু দিনের বাঁধা বাসার ভিত্তিমূল যেমন মুহূর্তের ভূমিকম্পে আল্‌গা হয়ে আসে রমেনের জীবনেও তাই হয়েছিল।

সহসা ও নিজের কাছেই স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল—মঞ্জরীকে এমন সমস্ত অন্তর দিয়ে ও কোন দিন কামনা করে নি—যেমন আজ মীনাক্ষীকে সে করছে। মীনাক্ষীকে বাদ দিয়ে ওর জীবন আজ অসম্ভব। মীনাক্ষীকে পাশে না পেলে বেঁচে থাকার কোন অর্থই নেই।

হাঁ—মঞ্জরীর সঙ্গে অভদ্রতাই সেদিন হয়েছিল। চরম অভদ্রতা। কিন্তু উপায় ছিল না।

মীনাক্ষীর বাবা-মা আপত্তি করেন নি। রমেনের অনেক টাকা। আর কেউ নেই—মাথার ওপর বাবা-মা নেই। সেই অগাধ সম্পত্তির রমেনই মালিক। সুশ্রী স্বাস্থ্যবান শিক্ষিত পাত্র। হাত-ছাড়া করা ঠিক নয়। মঞ্জরী পেল না বলে মীনাক্ষীও পাবে না—এর কোন অর্থ নেই।

আপত্তি মীনাক্ষীও করেনি।

তার তখন অল্প বয়স। সবে আই-এ পরীক্ষা দিয়েছে সে। অপরের বেদনার কথা বিবেচনা ক'রে আত্মত্যাগ করার মত মানসিক পুষ্টতার বয়স তখনও তার আসেনি। অল্প বয়স স্বার্থপরতারই বয়স। দিদির দিক থেকে রমেনের মন নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিতে পেরে একটা আত্মতৃপ্তিও অনুভব করেছিল। কিন্তু তাছাড়াও—নিজের মনের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষাও ওর জেগেছিল বৈকি!

তারপর?

ওদের বিবাহ হয়ে গেল—সমারোহেই। তার আগে মঞ্জরী চলে গেল মাস্টারী নিয়ে সুদূর মধ্য প্রদেশে। তার বুক সেদিন ভেঙে গিয়েছিল কিনা মঞ্জরীর মুখ দেখে বোঝা যায়নি—তা নিয়ে মাথাও ঘামায়নি রমেন। নতুন মীনাক্ষীর নেশা তাকে সেদিন পুরোনো সুরার মতই অভিভূত করে রেখেছিল।

সে খুব বেশি দিনের কথাও নয়। বছর চারেক হবে বড় জোর।

তার মধ্যে দুটি বছর কেটেছিল একটানা সুখ-স্বপ্নের মধ্য দিয়ে।

রমেনের কিছু না করলেও চলত। তবু সে একটা কলেজে অধ্যাপনা নিয়েছিল। নইলে নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ একঘেয়ে লাগবে—এই ভয়ে। প্রচুর অবসর এবং ছুটি। সে ছুটি কাটাত ওরা কোন না কোন শৈল-শিখরে। আবু থেকে শিলং—এবং মুশৌরী থেকে উটি, কোনটা বাদ ছিল না ওদের। সাত দিনের ছুটিও অপচয় করেনি ওরা।

রমেন বলত—'এমনিই চলুক, কি বল! সারাজীবন ব্যাপী হনিমুন!'

মীনাক্ষী ওর আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বলেছিল,

'কি জানি, ভয় করে বড় !'

তুটো বছর। তারপরই একটু একটু ক'রে রমেনের নেশা কাটতে লাগল। একটু একটু ক'রে ও অনুভব করলো যে, মীনাক্ষী শুধুই রূপ এবং যৌবন। ওকে নিয়ে মধুচন্দ্রমাই যাপন করা যায়—ঘর করা যায় না। সংসারের কোন খবর রাখে না মীনাক্ষী, রাখতে চায়ও না। সে শিক্ষা বা মন কিছুই তার নেই। সে শুধুই প্রজাপতি। মুহুর্মুহু সাজ বদলাতে পারে—হোটেল থেকে হোটেলে ঘুরে বেড়াতে পারে। কোন পুরুষের শান্ত গৃহকোণকে শান্তির নীড় করে তোলা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

ক্লান্ত হয়ে পড়ে পুরুষের মন। বিতৃষ্ণা জাগে ক্রমশ।

প্রেয়সী রূপে পুরুষ কখনও খুশি থাকে না। মাতৃরূপ চাই তার। বসন্ত না এলেও তার জীবন চলে যায়—বর্ষা তার চাই-ই।

এ কী করলে সে।…মঞ্জরীকে ছেড়ে মীনাক্ষীকে !

কাজটা ঠিক হয়নি। মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে।

এই যখন মনের অবস্থা তখন হঠাৎ দেখা পেলো সে রেবার। ওরই মামাতো বোনের ননদ। বড় শান্ত, বড় ভদ্র, বড় গোছালো মেয়েটি।

এতকাল আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। এখন আবার তাদের কথা মনে পড়ে। পালা করে যেতে যেতে মামাতো বোন পূর্ণিমাকেও মনে পড়েছিল রমেনের। অবস্থা ভাল নয়। ভগ্নিপতি স্কুল মাস্টার। পূর্ণিমার স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। ঐ রেবা মেয়েটি ঘরের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সব করে। তারই ফাঁকে ফাঁকে প'ড়ে গত বছর প্রাইভেটে স্কুল ফাইনাল দিয়েছে—এখন আবার প্রস্তুত হচ্ছে আই-এর জন্য। এর ভেতরেই নাকি একটা টিউশ্যানী করে। কখন সময় পায় কে জানে। কিন্তু ঘর-কন্নার কী শ্রী ! কি পরিচ্ছন্নতা। যত দেখে

ততই মুগ্ধ হয় রমেন। ওর মন বলে—এমনি একটি মেয়ের স্বপ্নই বুঝি ও দেখেছিল আশৈশব।

আরও বিরক্ত হয়ে ওঠে মীনাক্ষীর ওপর।

সে বিরক্তি থেকে বিদ্বেষ। বিবাদ।

শেষে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে গত মাঘ মাসে। রমেন এসে উঠেছে সাহেব পাড়ার একটা হোটেলে।

বিবাহ-বিচ্ছেদের কথাও উঠেছিল বৈকি!

মীনাক্ষী রূঢ় হলেও সত্যকে অস্বীকার করেনি। সে বুঝেছিল এ টানা-হেঁচড়ায় ওদের চলবে না। ছাড়তেই হবে। তবে সে ছাড়বে না। বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করতে চায় রমেন করুক—মীনাক্ষী করবে না। ওদের এক আত্মীয় যিনি মধ্যস্থ হয়ে এসেছিলেন তাকে স্পষ্টই বলেছিল সে, 'আমি ওর জীবনে সেধে আসি নি। ও-ই আমাকে ছিনিয়ে এনেছিল। এখন ফেলে দিতে হয় ও ফেলুক। আমি বাধা দেব না। কিন্তু নিজে হাতে নিজের জীবনের সব আলো নিভিয়ে দেব ওর সুবিধের জন্য—এত উদারতা আমার নেই।'

তাই অনিচ্ছায় হলেও শেষ পর্যন্ত রমেনকে প্রতাপ বাবুর কাছেই আসতে হয়েছিল আজ। সব কথা শুনে বলেছেন তিনি—'মীনুর পক্ষে অনেক সহজ হ'ত। নিষ্ঠুর ব্যবহার কারণ হিসেবে দিলেও চলত। কিন্তু তোমাকে কারণ দেখাতে হ'লে স্ত্রীর নামে অপবাদ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। অন্য কারুর সঙ্গে সে ব্যভিচার করেছে—এইটেই বলতে হবে। অবশ্য মীনু যখন আপত্তি করবে না বলেছে মামলা এক তরফা হতে—তখন আর বাধা কি—

শিউরে উঠেছিল রমেন।

তাই বলে এত বড় অপবাদ! বলেন কি! চিরকালের মত একটা

দাগ থেকে যাবে ওর নামে ! না, না—আপনি অন্য উপায় ভাবুন···

মাথা নেড়েছিলেন প্রতাপবাবু,—অন্য পথ নেই। ঐ একমাত্র উপায় আছে।

'বলেন কি ?'···

'এই আইন !'

'বয়' এসে প্রশ্ন করলে, 'কিছু ফরমাস করেছেন ?'

'ফরমাশ ?···না···চা দাও এক কাপ।···না না—কফি—'

সামনে একটা জাহাজ নোঙর করে রয়েছে। গঙ্গার সবটা দেখা যাচ্ছে না। তবু জোয়ারের সময় সেটা বেশ বোঝা যায়। জলটা একটু বেশী ঘোলা। তার ওপর বিকেলের রোদ পড়ে কেমন একরকম রঙ হয়েছে।

মীনু।

হ্যাঁ। মীনুর কথাই ভাবতে হবে ওকে।

এতবড় অপবাদ দেবে সে মীনুকে ?

মীনু ব্যভিচারিনী, অবিশ্বাসিনী ?

কিন্তু তা কেমন করে বলবে সে আদালতে ? অকারণে, বিনা অপরাধে এতবড় কলঙ্কের বোঝা সে মীনুর মাথায় তুলে দেবে ?···

আর যে দোষই থাক মীনু যে ওকে ভালবাসে, কেবলমাত্র ওকেই ভালবাসে, সে সংশয় অন্তত-রমেনের তো নেই।

এই বছর-খানেকের কলহ অশান্তির কুয়াশা তাদের জীবনকে যতই আবিল ক'রে তুলুক এমন ধরনের সংশয়ের কোন কারণ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

বরং সে-ই তো অপরাধী।

আইনের চোখে সে হয়তো ব্যভিচারী নয়। কিন্তু মঞ্জরী থেকে মীনু, মীনু থেকে রেবা—মানসিক ব্যভিচার কি নয় এই ইতিহাসগুলো? কোথাও কোন নিষ্ঠা ওর মনে বাসা বাঁধেনি। শুধু সম্ভোগের উপাদান চেয়েছে ও।

মনের বহুদূর পর্যন্ত তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে ও।

রেবা সম্বন্ধে ওর যে মনোভাব সেটাও কি সম্ভোগের মনোভাব?

হ্যাঁ—অস্বীকার করা চলবে না—সেটাও তাই। নতুন ধরণের সম্ভোগ—এই মাত্র। এবারে আর রূপ যৌবন নয়—এবার সে সম্ভোগ করতে চায় ওর অনলস সেবা, গৃহিনীপনা।

তার জন্য—তার এই নতুন ধরণের লাম্পট্য চরিতার্থ করবার জন্যে মীনুর নামে এতবড় অপবাদ দেবে সে?

সত্যিই তো মীনুর দোষ কি?

মীনুকে সে জোর করে কেড়েই এনেছে। মীনু তো তাকে ঠকায় নি। মীনু তো তার কোন পরিচয় গোপন করতে চায়নি। সেদিন রমেনেরই সময় ছিল না সে পরিচয় নেবার।

মীনাক্ষীও তাকে মনে মনে সেই প্রথম দেখার দিনটি থেকেই কামনা করেছিল। এ কথা বহুবার বলেছে সে। মীনাক্ষী যে তাকে পেয়ে চরিতার্থ হয়েছে একথাও অকপটে জানিয়েছে। অথচ গরজ সেদিন ছিল রমেনেরই।

মঞ্জরীর অভিশাপই বুঝি শেষ পর্যন্ত ওকে মীনাক্ষীকে নিয়ে সুখী হতে দেয়নি। আবারও অভিশাপ কুড়োবে সে?

বিশেষ করে এতখানি অপবাদ, মিথ্যা দুর্নাম দেবে সে?…

মীনু।…মীনু সরল, মীনু নির্মল।…মীনু অকপট। কোথাও

কোন মলিনতা নেই। অক্ষমতা আছে। কিন্তু সে কি তার দোষ! সে সম্বন্ধে সতর্ক তো রমেন আগে হয়নি।

এই বুফেরই ঐ চেয়ার খানা সাক্ষ্য দেবে—মীনাক্ষীর প্রেমে কোন ভেজাল, কোন খাদ ছিল না। ছিল বরং রমেনের ভালবাসাতেই। ভালবাসার অভিনয় সে ক'রে এসেছে এতকাল, ভাল সে কাউকেই বাসেনি।

অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল রমেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত। ভীড় নেই বলেই 'বয়'রা তাড়া লাগায়নি। একবারের কফি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল—পান করা হয়ে ওঠেনি। আবারও কফির হুকুম দিয়েছিল সে। সে কফিও অপেয় হয়ে উঠেছে।

অন্ধকার গঙ্গার জলে নেমেছে এক রহস্য, আলোতে আঁধারে চলেছে সেখানে অবর্ণনীয় খেলা। চারিদিকের এই কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে শুধু রমেনেরই যেন কিছু করবার নেই। জীবনে এই প্রথম সে অনুভব করেছে যে কামনার ঘোড়া অমন উদ্দাম বেগে ছোটাতে নেই। সেই অনুভূতির প্রচণ্ডতায়—এই কাঠের আসবাবগুলোর মতই জড়, অনড় হয়ে উঠেছে।

সে শিক্ষিত। লোকে বলে সে চরিত্রবান।

সে এমন কাজ করবে? ছি!

তার সমস্ত শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভদ্রবংশের রক্ত ধিক্কার দিয়ে ওঠে তাকে। ছি! ছি! ছি!

না। রেবা সুখী হোক। তার বিবাহের খরচা সে নিজেই না হয় বহন করবে। রেবার সঙ্গে একত্রে সুখী হওয়ার ভাগ্য তার নয়।

হয়ত কোন সুদূর ভবিষ্যতে মীনাক্ষীর সঙ্গে তার আবার মিলন হতে পারে। হয়ত কোন দিনই হবে না। কিন্তু তবু এত বড় মিথ্যা কথা সে বলতে পারবে না।

শেষ

